‘রাফ‘উল মালাম’

সম্মানিত ঈমামগণের সমালোচনার জবাব

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবন আবদুল হালীম

ইবন তাইমিয়্যাহ

৩০৫

অনুবাদ ও সম্পাদনা:

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

رفع الملام عن الأئمة الأعلام

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

ترجمة و مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর যাবতীয় নি'আমতের জন্য। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ যার কোনো শরীক নেই, তিনি ব্যতীত আসমানে কিংবা যমীনে আর কোনো হক্ক ইলাহ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা, রাসূল ও নবীদের আগমন ধারার পরিসমাপ্তিকারী। আল্লাহ তার ওপর, তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের ওপর তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিন অবধি সালাত পেশ করুন, আর যথার্থ সালাম প্রদান করুন। তারপর:

আলিমগণের সাথে সাধারণ মুসলিমের সম্পর্ক

কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরির পর মুমিনদের, বিশেষতঃ আলিমগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা মুসলিমদের অবশ্য করণীয়। কেননা আলিম সমাজ নবীকুলের উত্তরাধিকারী, আল্লাহ যাদেরকে নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বলতা ও নির্দিষ্ট অবস্থান দান করেছেন। তাদের দ্বারা জল-স্থলের তমাসার মধ্যে হিদায়াতের আলোপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল আলিমগণের হিদায়াতের ওপর পরিচালিত হওয়া এবং ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমগণ ঐকমত্য (ইজমা) পোষণ করেছেন।

বস্তুতঃ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে প্রত্যেক জাতির আলিমগণই তাদের কাওমের মধ্যে নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু মুসলিম জাতির আলিম সম্প্রদায় এ জাতির

সর্বোৎকৃষ্ট অংশ। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে তারাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফা এবং তাঁর সুন্নতের পুনর্জীবিতকারী। তাদের প্রচেষ্টায়ই কুরআন মজীদ সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় আছে এবং কুরআনের কারণে তারাও দীনের ওপর কায়েম আছেন। কুরআন তাদের সম্পর্কে বর্ণনামুখর। আর তারাও কুরআন মজীদ অনুযায়ী কথা বলে।

কোনো ইমাম ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলের সুন্নাতের খেলাফ করেন নি

স্মরণযোগ্য যে, সর্বজনস্বীকৃত কোনো ইমাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের, তা ছোট হোক বা বড় হোক, খেলাফ করেন নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে তারা সুনিশ্চিতভাবে একমত। আর এ ব্যাপারেও তারা একমত একমত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ছাড়া অন্য যে কোনো লোকের বাণী গ্রহণও করা যেতে পারে বা প্রত্যাখ্যানও করা যেতে পারে। (অর্থাৎ যদি তাদের কথা শুদ্ধ হয়, তবে তা গৃহীত হবে। আর যদি ভুল হয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।) তাই ইমামগণের কোনো রায় সহীহ হাদীসের খেলাফ হলে তা বর্জনের জন্য তাদের নিকট কোনো অজুহাত থাকতে হবে।

হাদীস বর্জনের কারণগুলো তিন ভাগে বিভক্ত

প্রথমত: এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এ বিশ্বাস পোষণ না করা।

দ্বিতীয়ত: বিশ্বাস না করা যে, এই হাদীস দ্বারা উক্ত মাসআলার প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত: এই হাদীস মনসুখ বা রহিত (Repealed) হয়ে গেছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস করা।

উল্লিখিত তিনটি কারণ থেকে আরও বহু কারণের উদ্ভব হয়ে থাকে।

প্রথম কারণ

হয়ত হাদীসটি তাঁর নিকট পৌঁছে নি, আর যার কাছে হাদীস পৌঁছে নি তাকে হাদীস যা চায় সেটা জানতে বাধ্য করা যায় না। তাঁর নিকট ঐ হাদীস না পৌঁছার কারণে কোনো ব্যাপারে আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্য (যা উক্ত অর্থ প্রকাশের জন্য আনা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় নি এবং যাতে অন্য অর্থ হওয়ার সম্ভাবনাও বিদ্যমান) কিংবা অন্য হাদীস অথবা কিয়াসের চাহিদা অথবা ইসতেসহাবের (কোন বস্তুর মৌল গুণ) দ্বারা রায় প্রদান করতেই পারে, আর তখন সেটা ঐ হাদীসের অনুকুলেও হতে পারে, আবার কখনও তার প্রতিকুলেও যায়। সালাফে সালেহীনের কোনো কোনো হাদীস বিরোধী বক্তব্যের জন্য উপরোক্ত কারণটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কারণ হিসেবে বিবেচিত।

কেননা উম্মতের কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত হাদীস পূর্ণরূপে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন, বিচার করতেন, কোনো বিষয়ে ফাতওয়া দিতেন অথবা কোনো কাজ

করতেন, তখন উপস্থিত লোকগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শ্রবণ করতেন কিংবা অবলোকন করতেন। অতঃপর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকেই কিংবা কেউ কেউ শ্রুত বা পরিদৃষ্ট হাদীসটি অপরের নিকট পৌঁছাতেন। তারপর উক্ত হাদীসটি বিজ্ঞ সাহাবী, তাবেঈন ও তাদের পরবর্তীগণের মধ্যে যাদের কাছে আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাদের কাছে পৌঁছাতেন।

এরপর অন্য একটি মজলিসে হাদীস বর্ণিত হত, সিদ্ধান্ত হত, বিচার করা হত অথবা কোনো কাজ করা হত। যারা পূর্বের মজলিসে অনুপস্থিত ছিলেন, তাদের কেউ কেউ পরবর্তী মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। যাঁদের পক্ষে সম্ভব হত তারা শ্রুত হাদীসটি প্রচার করতেন। অতএব, পূর্বের মজলিসে উপস্থিত লোকদের যে জ্ঞান লাভ হয়, তা পরবর্তী মজলিসে উপস্থিত লোকদের হয় নি, আবার পরবর্তী মজলিসের লোকদের যে জ্ঞান লাভ হয় তা পূর্ববর্তী লোকদের হয় নি।

বিজ্ঞ সাহাবীগণের মর্যাদার তারতম্য

সাহাবী ও তাদের পরবর্তীগণের (তাবেঈ ও তাবে‘ তাবে‘ঈন) পরস্পরের প্রাধান্য নির্ভর করে তাদের জ্ঞানের গভীরতা, ব্যাপকতা ও উৎকর্ষের ওপর। একজনের পক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পূর্ণ হাদীস আয়ত্ব করা সম্ভব, এরূপ দাবী করা ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীন থেকেই আমরা বিষয়টির প্রমাণ পাই। যাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা, নিয়ম পদ্ধতি ও চলাফেরা ইত্যাদি অবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত।

বিশেষতঃ আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু দেশে-বিদেশে কখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করেন নি, বরং অধিকাংশ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে থাকতেন। এমনকি মুসলিম জাতির প্রয়োজনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনি বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতেন। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুও ছিলেন অনুরূপ। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলতেন:

«دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ»

“আমি, আবু বকর ও উমার প্রবেশ করেছি এবং আমি, আবু বকর ও উমার বের হয়েছি”।[1]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ও দাদীর মিরাস সংক্রান্ত হাদীস তার কাছে না পৌঁছা

এতদসত্ত্বেও যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দাদীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি (মিরাস) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বললেন, “তোমার জন্য আল্লাহর কুরআনে অংশ নির্ধারিত নেই এবং হাদীসেও তদ্রূপ কোনো নির্দেশ আমারা জানা নেই। তবে আমি লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। লোকদিগকে জিজ্ঞেস করা হলে মুগীরা ইবন শো‘বা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে,

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৮৯।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطَاهَا السُّدُسَ»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদীকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/৬ (এক ষষ্ঠাংশ) দিয়েছেন[2]।” অনুরূপভাবে ইমরান ইবন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুও এই হাদীসটি পৌঁছিয়েছেন।

উপরোক্ত তিনজন সাহাবী (যারা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন), আবু বকর কিংবা অন্যান্য খলীফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের সমকক্ষ নন। তথাপি তারাই বিশেষ করে এ হাদীসটি সম্পর্কীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, আর এ হাদীসটির ওপর আমলের ব্যাপারে সমস্ত উম্মত একমত।

কতকগুলো মাসআলা যেগুলো সম্পর্কে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু রায় প্রদানের পূর্বে তাঁর নিকট সংশ্লিষ্ট হাদীস পৌঁছে নি

১. অনুমতির জন্য সালামের বিধান সংক্রান্ত হাদীস:

অনুরূপভাবে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু, তিনিও কোনো ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি প্রার্থনার হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত আবূ মুসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে এ বিষয় অবহিত করলেন এবং আনসারদের দ্বারা নিজের বক্তব্যের সপক্ষ্যে প্রমাণ পেশ করলেন[3]। অথচ যিনি (আবু মুসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু) উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ সুন্নাহ সম্পর্কে অবহিত করলেন, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তার থেকে অনেক বেশি জানতেন।

[2] তিরমিযী, হাদীস নং ২১০০; আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৮৯৪।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৬২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৫৩।

২. স্ত্রীকে স্বামীর দিয়তে অংশিদার করা সংক্রান্ত হাদীস:

তদ্রূপ উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু, স্বামীর দিয়তে (রক্ত বা যখম জনিত জরিমানাস্বরূপ প্রাপ্ত সম্পদে) স্ত্রী অংশীদারী হবে কিনা এ বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন না, বরং তার ধারণা ছিল, দিয়ত 'আকেলার (ফরায়েযে যারা 'আসাবা হয় তাদের) প্রাপ্য। অবশেষে দাহ্হাক ইবন সুফইয়ান আল-কিলাবী, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় কোনো গ্রাম্য এলাকায় আমীর ছিলেন, তিনি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের বর্ণনা দিয়ে বললেন যে,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশইয়াম আদ্দিবাবীর স্ত্রীকে স্বামীর দিয়তের ওয়ারিশ করেছেন।" ফলে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় মত পরিত্যাগ করলেন এবং বললেন, যদি আমরা এই হাদীস না শুনতাম তবে এর বিপরীত ফয়সালা দিতাম[4]।"

৩. অগ্নি উপাসকদের থেকে জিযিয়া নেওয়া সংক্রান্ত হাদীস:

অনুরূপভাবে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে জিজিয়া কর আদায় করা হবে কিনা এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না। অবশেষে আব্দুর রহমান ইবন 'আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে রাসূলের হাদীস শুনালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

[4] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৪৫২; আবু দাউদ, হাদীস নং ২৯২৭; তিরমিযী, হাদীস নং ১৪১৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৬৪২।

«سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»

"তাদের সাথে জিযিয়ার ব্যাপারে আহলে কিতাবদের ন্যায় আচরণ কর[5]।"

৪. মহামারী লাগলে সেখানে না যাওয়া ও সেখান থেকে পলায়ন না করা সংক্রান্ত হাদীস:

তদ্রূপ যখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সারগ[6] নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন খবর পেলেন যে, শাম দেশে (সিরিয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকা) প্লেগের (Plague) প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায়, তিনি তার কাছে অবস্থিত মুহাজিরীনে আউয়ালিনের (যারা ইসলামের প্রথম অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) নিকট পরামর্শ চাইলেন। তৎপর আনসারদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তৎপর মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী সময়ের মুসলিমদের মতামত চাইলেন। তারা সকলেই নিজ নিজ অভিমত পেশ করলেন। কেউই এ সম্পর্কে হাদীস বলতে পারলেন না। এ সময় আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু আগমন করলেন এবং মহামারী সংক্রান্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[5] মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, হাদীস নং ৪২; মুসনাদে শাফে‘ঈ, পৃ. ২০৯।

[6] সিরিয়ার হাজীরা যখন হজের জন্য আসে তখন সিরিয়ার শেষ প্রান্ত ও হিজাযের শুরু এলাকায় অবস্থিত একটি এলাকা, যা আল-মুগীসাহ ও তাবুকের মাঝখানে অবস্থিত একটি জনপদের নাম। কারও কারও মতে, সেটি মদিনা থেকে ১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।

«إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ»

“তোমাদের অবস্থানকালীন কোনো স্থানে মহামারী দেখা দিলে তোমরা ঐ জায়গা হতে পালিয়ে যেও না এবং কোনো স্থানে মহামারীর প্রার্দুভাবের কথা শুনলে সেখানে তোমরা প্রবেশ করো না।”[7]।

৫. সালাতে সন্দেহ পোষণের মাসআলা সংক্রান্ত হাদীস:

‘উমার ও আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সালাতে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তির হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সম্পর্কে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পূর্বে কোন সহীহ হাদীস পৌঁছে নি। তখন আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসটি শুনালেন, যাতে এসেছে যে, তোমাদের কেউ যখন সালাতে সন্দেহ করবে এবং বলতে পারবে না কয় রাকাত পড়েছে, তিন নাকি চার, তাহলে সে যেন,

«يَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ»

“সন্দেহযুক্ত অংশ দূরে নিক্ষেপ করে এবং দৃঢ় অংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে”[8]।

---

[7] মুসনাদে আহমাদ ১/১৮২; অনুরূপ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২১৮।

[8] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭১; মুসনাদে আহমাদ, ৩/৮৩।

৬. উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ঝড় তুফান সংক্রান্ত হাদীস:

একদা সফরকালে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ভীষণ ঝড়ের সম্মুখীন হলেন এবং বলতে লাগলেন, "কে আমাদেরকে ঝড় সম্পর্কীয় হাদীস শুনাবে"? তখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যখন আমার নিকট উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথাটি পৌঁছলো তখন আমি দলের পশ্চাতে ছিলাম। অতঃপর আমি আমার বাহনকে তাড়াতাড়ি চালালাম এবং উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পৌঁছলাম। অতঃপর ঝড় প্রবাহের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত হাদীস তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম[9]।

---

[9] হাদীসটি হচ্ছে, «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا» "ঝড় আল্লাহর পক্ষ হতে প্রবাহিত হয়ে থাকে, তখন তা কখনও রহমত বহন করে আবার কখনও আজাব (শাস্তি) বহন করে। অতএব, যখন তোমরা ঝড় প্রবাহিত হতে দেখ, তখন তাকে গালি দিও না, বরং আল্লাহ্‌র নিকট মঙ্গল কামনা কর এবং অমঙ্গল হতে পরিত্রাণ লাভের প্রার্থনা কর)। (মুসনাদে আহমাদ, ২/২৬৭; আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৯৭; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩২২৭)

অনুরূপ বর্ণনা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকেও এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঝড় প্রবাহিত হতো, তখন বলতেন, "হে আল্লাহ আমি কল্যাণসূচক ঝড় কামনা করি এবং এর মধ্যে যা কিছু কল্যাণ তাও চাই, আর এ ঝড় যে কল্যাণসহ প্রেরিত হয়েছে সেটাও পেতে চাই। আর আমি অকল্যাণসূচক ঝড় থেকে আশ্রয় চাই এবং এর মধ্যে যা কিছু অকল্যাণ রয়েছে তা থেকে আশ্রয় চাই, আর এ ঝড় যে অকল্যাণসহ প্রেরিত হয়েছে তা থেকেও আশ্রয় চাই।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৯৯)

উল্লিখিত মাসআলাগুলো এমন মাসআলা যে বিষয়ের হাদীস উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পৌঁছে নি, শেষ পর্যন্ত তাঁকে তারা হাদীস পৌঁছিয়েছেন যারা মান-মর্যাদা ও সম্মানে কেউই তার সমকক্ষ নন।

অনুরূপ আরও কিছু স্থান রয়েছে যেখানে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুওর কাছে রাসূলের সুন্নাত পৌঁছে নি, সে সব স্থানে তিনি হাদীস ব্যতিরেকেই বিচার করেছেন অথবা হাদীসের ভাষ্যের বাইরেই ফাতওয়া দিয়েছেন।

৭. উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অঙ্গুলির দিয়াত সংক্রান্ত হাদীস:

তদ্রূপ তাঁর (উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর) বিচারিক রায় ছিল যে, সকল অঙ্গুলির দিয়ত সমান নয়। বরং অঙ্গুলির উপকারিতার তারতম্য অনুসারে তার দিয়তও কম বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু আবূ মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তার তুলনায় জ্ঞানের দিক দিয়ে কম হওয়া সত্ত্বেও এ হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, তাদের জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَام

“বৃদ্ধাঙ্গুলী ও অনামিকার দিয়ত সমান সমান।”[10]

[10] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৮৯৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৫৫৮; তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৯২; নাসাঈ, হাদীস নং ৪৮৪৭।

মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে এ হাদীসটি তার (মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পৌঁছলে তিনি সে অনুসারে রায় প্রদান করেন। মুসলিমদের এর অনুসরণ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য তার পক্ষ থেকে যে মত প্রদান করেছিলেন সেটা দোষণীয় ছিল না। কারণ, তার নিকট উক্ত হাদীস পৌঁছে নি।

৮. উমার ও ইহরাম এবং তাওয়াফে ইফাদার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার সংক্রান্ত হাদীস:

অনুরূপভাবে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু মুহ্‌রিম ব্যক্তিকে (ইহরাম পরিধানকারী ব্যক্তি) হজ্জ ও উমরাহ’র ইহরামের পূর্বে এবং জামরাতুল ‘আকাবায়ে কংকর নিক্ষেপ করার পর মক্কায় তওয়াফে ইফাদা (হজ্জের ফরয তওয়াফ) এর পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। তিনি এবং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ এবং অন্যান্য মর্যাদাবান সাহাবীগণ এই নিষেধ সংক্রান্ত বিধান দিতেন। তাদের নিকট আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঐ হাদীস পৌঁছে নি। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

«طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ، قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং হালালের জন্য (ইহরাম খোলার পর) তাওয়াফ (ইফাদা) এর পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম[11]।”

৯. উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও চামড়ার মোজার উপর মাসেহ-এর মেয়াদ সংক্রান্ত হাদীস:

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু চামড়ার মোজা না খোলা পর্যন্ত অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোজা পরিধানকারীকে মোজার উপর মাসেহ করার হুকুম দিতেন। সালাফে সালেহীনের একদল এই মত অনুসরণ করেন। তাদের নিকট মোজার উপরে মাসেহ এর সময় নির্ধারণ সংক্রান্ত হাদীস পৌঁছে নি। পক্ষান্তরে, এমন কতিপয় লোকের নিকট সময় নির্ধারণ সংক্রান্ত সহীহ হাদীস পৌঁছেছিল যারা জ্ঞানের দিক দিয়ে তাদের (উমার ও তার অনুসারীদের) সমকক্ষ ছিলেন না। অথচ এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন পন্থায় সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে[12]।

কতিপয় মাসআলা সংক্রান্ত হাদীস, যা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পৌঁছে নি

---

[11] নাসাঈ, হাদীস নং ২৬৮৫; অনুরূপ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩৯; ১৭৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮৯।

[12] মুসনাদে আহমাদ, ১/১১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬; নাসাঈ, হাদীস নং ১২৮, ১২৯।

১. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও বিধবার নিজ ঘরে ইদ্দত পালন সংক্রান্ত হাদীস:

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিধবার নিজ ঘরে ইদ্দত পালন করা সম্পর্কিত হাদীস জানতেন না। অবশেষে আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বোন ফুরাই'আহ বিনতে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহা, যার স্বামী মারা যাওয়ার পর, তার বিষয়ে রাসূলের হাদীস শুনালেন। যখন ফুরাই'আহ্‌র স্বামী মারা যায়, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন:

«امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»

"ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তোমার ঘরেই থাক।"[13] অতঃপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এ হাদীস গ্রহণ করলেন।

২. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকার করা প্রাণী সংক্রান্ত হাদীস:

একদা শিকারকৃত পশু ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হাদিয়া দেওয়া হলো এবং জন্তুটি তাঁর জন্যই শিকার করা হয়েছিল, তিনি ওটা খাবার ইচ্ছা করেছিলেন। এমন সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীস শুনালেন যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (ইহরাম অবস্থায়)

---

[13] আবু দাউদ, হাদীস নং ২৩০০; তিরমিযী, হাদীস নং ১২০৪; নাসাঈ, হাদীস নং ৩৫৩২; ইবন মাজাহ, ২০৩১।

শিকারকৃত গোশত হাদিয়া (Gift) দেওয়া হলে তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন।”[14]

কতিপয় মাসআলা সম্পর্কিত হাদীস, যা ‘আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিকট পৌঁছে নি

১. ‘আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সরাসরি তাওবার সালাত সংক্রান্ত হাদীসটি পৌঁছে নি:

অনুরূপভাবে ‘আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যখন কোনো হাদীস শুনতাম, তা দ্বারা আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত আমাকে উপকৃত করতেন। পক্ষান্তরে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করলে আমি তার নিকট হতে শপথ (Oath) নিতাম। শপথ করার পর আমি তার বর্ণিত হাদীস বিশ্বাস করতাম। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট তাওবার সালাতের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সঠিক বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি (‘আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাওবা সংক্রান্ত সালাতের বিখ্যাত হাদীসটি বর্ণনা করেন[15]।

---

[14] মুসনাদে আহমাদ ১/১০০।

[15] হাদীসটি হচ্ছে, «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١١٠﴾ [النساء : ١١٠] “যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করে, তারপর ভালোভাবে অযু করে দু’রাকাত সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ

২. আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও গর্ভবর্তী বিধবা স্ত্রী লোকের ইদ্দতকাল সংক্রান্ত হাদীস:

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, গর্ভবর্তী বিধবা স্ত্রীলোকের, দুই নির্ধারিত ইদ্দত (সন্তান প্রসবের ইদ্দত এবং স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিয়ের জন্য যে ইদ্দত) এ মধ্যে দীর্ঘতম যেটি সে ইদ্দত পালন করার ফাতওয়া প্রদান করতেন। সুবাই‘আহ্ আল আসলামিয়্যাহ সম্পর্কে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসটি তাদের নিকট পৌঁছে নি। সুবাই‘আহ্র গর্ভাবস্থায় তাঁর স্বামী সা‘দ ইবন খাওলার মৃত্যু হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য ফাতওয়া দিয়েছিলেন যে, “তার ইদ্দতকাল হচ্ছে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত”[16]।

৩. আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মহর ব্যতিরেকে বিবাহিতা স্ত্রীর মহরের পরিমাণ:

তাকে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত আয়াতটি পাঠ করেন যাতে আল্লাহ বলেন, “যারা কোনো অপছন্দীয় এবং গর্হিত কাজ করে অথবা নফসের ওপর অত্যাচার করে, তৎপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, (তখন আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন)।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১০] (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

[16] এ অর্থে হাদীস দেখুন, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯০৯, ৫৩১৯, ৫৩২০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৮৫।

আলী, যায়েদ ইবন সাবেত, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম এবং আরও অনেকেই মাহর নির্ধারণ ব্যতিরেকেই বিয়েতে স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করলে এ ফাতওয়া দিতেন যে, তাঁর মাহর দিতে হবে না। কেননা তাদের নিকট বারওয়া‘ বিনতে ওয়াশেক সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসটি পৌঁছে নি[17]।

এ এক বিরাট অধ্যায়। সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত এরূপ ঘটনার সংখ্যা অগণিত। কিন্তু সাহাবীগণ ব্যতীত অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত সংখ্যাও হাজার হাজার, যার সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

উল্লিখিত সাহাবীগণ উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ-ফকীহ, বুদ্ধিমান জ্ঞানী, তাকওয়াবান ও উৎকৃষ্ট। তাদের পরবর্তীগণ এ সকল গুণাবলী হতে আনুপাতিক হারে অপূর্ণ। সুতরাং তাদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কোনো হাদীস অজানা বা অস্পষ্ট থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয় এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই।

কোনো ইমামের সব সহীহ হাদীস জানা ছিল না

সুতরাং যারা ধারণা করে যে, প্রত্যেক ইমাম অথবা কোনো নির্দিষ্ট ইমামের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি সহীহ

---

[17] হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, তিরমিযী, হাদীস নং ১১৪৫; নাসাঈ, হাদীস নং ৩৩৫৪। উক্ত হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সে মহিলার মাহর হবে তার সমগোত্রীয়দের মাহরের অনুরূপ (মাহরে মাসাল)।

হাদীস পৌঁছেছে, তারা নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই নয়, তারা মারাত্মক ভুলে নিপতিত।

কেউ যেন কখনও এ কথা না বলেন যে, হাদীসসমূহের একত্রিকরণ ও সংকলনের পর সেগুলোর অস্পষ্টতা বা অজানা থাকা দূরবর্তী সম্ভাবনা মাত্র; কেননা সুনান সংক্রান্ত হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থ (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ, আবু দাউদ) এগুলো স্বীকৃত-অনুসৃত ইমাম (আল্লাহ তাদের ওপর রহমত করুন) তাদের তিরোধানের পরই সংকলিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় হাদীস কোনো সুনির্দিষ্ট সংকলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা বৈধ নয়।

তারপর যদিও বা ধরে নেওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ সংকলিত হাদীসের কিতাবসমূহে সীমাবদ্ধ, তবুও ঐ কথা বলা যায়না যে, একজন আলিম কিতাবের সমুদয় ইলম সম্পর্কে জ্ঞাত। আর কারও জন্য এরূপ বিদ্যার্জন প্রায় অসম্ভব; বরং কখনও এরূপ হয়ে থাকে যে, একজন লোকের নিকট অনেক অনেক সংকলন আছে, অথচ সংকলিত বস্তু তার পূর্ণ আয়ত্বে নেই।

বরং হাদীস শাস্ত্রের এরূপ সংকলনের সময়কালের পূর্বের লোকেরা পরবর্তী লোকদের থেকে রাসূলের সুন্নাত সম্পর্কে অনেক বেশি জ্ঞাত ছিলেন। কেননা তাদের নিকট যেগুলো সহীহ ও সঠিকভাবে পৌঁছেছে, এমন অনেকগুলো আমাদের নিকট কখনও কখনও 'মাজহূল' অখ্যাত লোকের মাধ্যমে পৌঁছেছে কিংবা বিচ্ছিন্ন সনদে পৌঁছেছে কিংবা হাদীসটি আদৌ পৌঁছে নি।

তাদের বক্ষ ছিল সংকলিত গ্রন্থস্বরূপ। কেননা তাদের বক্ষ ঐ সকল গ্রন্থ রাজি হতেও বহুগুণ অধিক ধারণ করত। এ বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা সন্দেহ করেন না।

মুজতাহিদের জন্য এটা শর্ত নয় যে তিনি সকল সহীহ হাদীস তার জানা থাকতে হবে

কোনো কথকের এ কথা বলাও উচিৎ নয় যে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, সে মুজতাহিদ হতে পারবে না। কেননা মুজতাহিদ হওয়ার জন্য যদি এ শর্ত করা হয় যে, তাকে আহকাম সম্পর্কিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমূদয় কথা ও কর্ম সংক্রান্ত হাদীস জানতে হবে, তাহলে উম্মতের মধ্যে কোনো মুজতাহিদ পাওয়া যাবে না। তবে একজন আলিমের জন্য এটা যথেষ্ট যে, সে এর অধিকাংশ বিষয়বস্তু ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবে। বিস্তারিত বিষয়ের অংশ বিশেষ ছাড়া সবই তার কাছে স্পষ্ট হবে। অধিকন্তু অল্প কিছু যা তার অজানা তা আবার কখনও তার নিকট পৌঁছানো হাদীসের বিপরীত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় কারণ

দ্বিতীয় কারণ এই যে, হাদীসটি ইমামের নিকট পৌঁছেছে, কিন্তু কতিপয় কারণে তা তার কাছে নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয় নি।

কারণগুলো হলো:

তার কাছে যিনি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন সে মুহাদ্দিস কিংবা সে মুহাদ্দিস যে মুহাদ্দিসের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন অথবা সনদের অন্য কোনো ব্যক্তি ইমামের নিকট মাজহূল তথা অপরিচিত কিংবা মুত্তাহাম তথা মিথ্যা বর্ণনাকারীর অভিযোগে অভিযুক্ত অথবা সাইয়্যেউল হিফয তথা (হাদীস শাস্ত্রে) স্মৃতি শক্তিতে দুর্বল অথবা হাদীসটি তার নিকট মুসনাদ তথা সনদপরম্পরার ধারাবাহিকতা সম্পন্ন অবস্থায় পৌঁছে নি, বরং মুনকাতে‘ তথা সনদের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পৌঁছেছে। কিংবা হাদীসের শব্দগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয় নি। যদিও ঐ হাদীসটি অপর একজনের নিকট নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী দ্বারা মুত্তাসিল সনদে পৌঁছেছে। যেমন, যে বর্ণনাকারী ইমামের নিকট ছিল মাজহূল বা অপরিচিত, তিনি অন্যের নিকট একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি প্রমাণিত হবেন। অথবা এরূপও হয়ে থাকে যে, ঐ হাদীসটি অন্য সনদে বর্ণিত, যার বর্ণনাকারী কোনো অভিযোগে অভিযুক্ত নয়। অথবা ঐ সনদটি ইনকেতা‘ (বিচ্ছিন্ন পন্থা) নয় বরং অন্য কোনো দিক থেকে মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাপরম্পরার মাধ্যমে এসে তার কাছে পৌঁছবে, আর হাদীস শাস্ত্রের কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাফেয সেই হাদীসের শব্দগুলিকে যথাযথ সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন অথবা সে বর্ণনাটির সপক্ষে এমন কতকগুলো মুতাবা‘আত (একই বর্ণনাকারী থেকে অন্য সনদে একই হাদীস প্রাপ্ত হওয়া) ও শাওয়াহেদ (একই অর্থে অন্য বর্ণনাকারী থেকে হাদীস প্রাপ্ত হওয়া) দৃষ্টিগোচর রয়েছে, যার দ্বারা উক্ত হাদীসটি তার কাছে শুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে।

আর এ বিষয়টি তাবে‘য়ীন ও তাবে’ তাবে‘য়ীন হতে আরম্ভ করে তাদের পরবর্তী প্রসিদ্ধ ইমামগণের মধ্যে বহুল পরিমানে পাওয়া যায়। আর এটি প্রথম যুগের চেয়েও পরবর্তী যুগে এবং প্রথম কারণের চেয়েও বেশি দৃষ্ট হয়ে।

কেননা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হাদীস প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল, তাতে এমনও বহু হাদীস ছিল যা বহু আলিমের নিকট দুর্বল পন্থায় পৌঁছেছে। আবার অনেকের কাছে ঐ পন্থা ব্যতীত সেগুলো অপর সহীহ পন্থায় পৌঁছেছে। সুতরাং এ পর্যায়ে অত্র হাদীসগুলো দলীল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যদিও বিপক্ষীয়দের নিকট সেগুলো অন্য (সহীহ) পন্থায় সেগুলো না পৌঁছে থাকে।

এ কারণেই বহু ইমামের কথায় দেখা যায় যে, তারা হাদীসের সঠিকতার শর্ত আরোপ করে মত প্রদান করতেন। তারা বলতেন যে, অমুক মাসআলায় আমার রায় বা মত হচ্ছে এই[18], তবে সেখানে একটি হাদীস বর্ণিত আছে[19]। কিন্তু যদি হাদীসটি সহীহ হয়, তবে সেটাই আমার মত হিসেবে বিবেচিত হবে[20]।

তৃতীয় কারণ

---

18 অর্থাৎ সে মতটি তার একান্ত নিজের ইজতেহাদপ্রসূত।

19 অর্থাৎ দুর্বল হাদীস।

20 অর্থাৎ তখন আমার ইজতেহাদপ্রসূত কথার মূল্য থাকবে না, বরং হাদীসের কথাই আমার কথা।

ইমামের ইজতিহাদ মোতাবেক হাদীসকে দুর্বল মনে করা। যেখানে অন্য আলিমগণ সেটাকে দুর্বল আখ্যায়িত করেন না। এখানে অন্য কোনো পন্থায় সেটি এসেছে কি না সেদিকে দৃষ্টিপাত না দেওয়া সত্ত্বেও এবং এখানে সঠিক মতটি তার (দুর্বল ধারণাকারী মুজতাহিদের) হোক অথবা তার বিপক্ষীয় লোকের (যিনি দুর্বল বলেন নি তার) হোক অথবা উভয়ের কাছেই হোক; বিশেষ করে যারা মনে করে যে, সকল মুজতাহিদই সঠিক পথের উপর আছে; সর্বাবস্থায় একই বিধান। (অর্থাৎ হাদীসকে দুর্বল মনে করা হাদীসের ওপর আমল না করার একটি কারণ)।

এর কতগুলো কারণ রয়েছে

১. হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসকে তিনি (যিনি হাদীসের ওপর আমল করেন নি এমন ইমাম) দুর্বল বলে বিশ্বাস করেন, পক্ষান্তরে অন্য ইমামের মতে তিনি নির্ভরযোগ্য। আর বর্ণনাকারীদের পরিচয় লাভ সংক্রান্ত রিজাল শাস্ত্র একটি ব্যাপক বিদ্যা। (যেখানে মতভেদ ঘটেই থাকে, সুতরাং সেটা অনুসারে বর্ণনাকারীর ব্যাপারে দু' ইমামের দু'টি মত থাকা অস্বাভাবিক নয়)।

কারণ, কখনও কখনও যে ইমাম হাদীসের বর্ণনাকারীকে দুর্বল মনে করেছেন, তার কথা সঠিক হয়ে যেতে পারে। কেননা তার জানা আছে যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারী কোনো অভিযোগে অভিযুক্ত, আবার কখনও অন্য ইমাম হাদীস বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন, তার কথাও সঠিক হতে পারে। কেননা যে কারণে তাকে দুর্বল বা দোষনীয় মনে করা হয়েছে, সেই কারণটি দোষণীয় নয় অথবা এ জাতীয় কিছুই

দোষণীয় নয় অথবা সে বর্ণনাকারীর সে কারণটির পিছনে কোনো সুনির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য ওযর ছিল, (ফলে সে বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলা চলবে না)। এটাও এক প্রশস্ত অধ্যায়। (যেখানে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য থাকতেই পারে।)

আর হাদীসের রিজাল শাস্ত্র তথা বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা সংক্রান্ত বিষয়ে এমন মতৈক্য ও মতভেদ রয়েছে। যেমন, অন্যান্য বিষয়েও আলিমদের মধ্যে তা রয়েছে।

২. (যিনি হাদীসের ওপর আমল করেন নি, তিনি উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী) মুহাদ্দিস শ্রুত হাদীস, বর্ণনাকারী হতে শুনেছেন বলে বিশ্বাস না করা, অথচ অন্যজন (যিনি হাদীসটির ওপর আমল করেছেন, তিনি) মনে করছেন যে মুহাদ্দিস এ হাদীস যার থেকে বর্ণনা করেছেন, তার কাছ থেকে শুনেছেন, আর তার এ দাবীর পিছনে বেশ কিছু জানা কারণ রয়েছে যা তাকে এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে। (অর্থাৎ হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস হাদীসটি তার বর্ণনাকারী থেকে শুনেছেন বলে প্রমাণ হয়)।

৩. মুহাদ্দিসগণের দুই অবস্থা হয়ে থাকে: (ক) দৃঢ় অবস্থা ও (খ) নড়বড়ে অবস্থা। যেমন, বার্ধক্যজনিত কারণ ইত্যাদির জন্য জ্ঞান লোপ পাওয়া অথবা তার পুস্তক পুড়ে নষ্ট হওয়া। সুতরাং যা সে দৃঢ় ও সুস্থ অবস্থায় বর্ণনা করেছে, তা সহীহ (সঠিক) গ্রহণযোগ্য। আর যা অস্থির অবস্থায় বর্ণনা করেছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং বর্ণিত হাদীসটি কোন অবস্থায় বর্ণিত হয়েছে তা অজানা, কিন্তু অপর ইমাম সেই মুহাদ্দিস বর্ণনাকারীর

দৃঢ় ও সুস্থ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে জানালেন যে, এ হাদীসটি তার দৃঢ় ও সুস্থ অবস্থায় বর্ণিত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

৪. বর্ণিত হাদীসটি মুহাদ্দিস ভুলে গিয়েছেন। তৎপর তিনি তা স্মরণ করতে পারেন নি। অথবা তিনি উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে অস্বীকার করেন। সুতরাং কোনো ইমাম ঐ হাদীসের ওপর এজন্য আমল করেন নি, যেহেতু তার বর্ণনাকারী ঐ হাদীসের বর্ণনা অস্বীকার করেছেন, আর এটি তার নিকট এমন এক দোষ, যা এ হাদীসের ওপর আমল করতে বাধা প্রদান করে। পক্ষান্তরে অন্য ইমাম মনে করেন যে, এ ধরনের হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণ করা শুদ্ধ। আর এই মাসআলাটি একটি বিখ্যাত মাস'আলা।

৫. হাদীসে আমল না করার কারণ এও হয়ে থাকে যে, বহু সংখ্যক হিজাযী মুহাদ্দিসের মতে ইরাকী ও শামীদের (সিরীয়) বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষন পর্যন্ত ঐ হাদীসের মূল হিজাযে বিদ্যমান না থাকে। এমনকি তাদের কেউ বলেছেন, ইরাকবাসীদের বর্ণিত হাদীস "আহলে কিতাব" এর বর্ণিত হাদীসের সমপর্যায়ভুক্ত, তাতে বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস কোনোটাই করবে না।

আরও বর্ণিত আছে, কোনো মুহাদ্দিসকে প্রশ্ন করা হলো- সুফিয়ান মনসূর হতে, মনসূর ইবরাহীম থেকে, ইবরাহীম আলকামা থেকে, আলকামা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত সনদ গ্রহণযোগ্য কিনা? তদুত্তরে তিনি বলেন, হিজাযে তার আসল মওজুদ না থাকলে তা দলীল হতে পারে না। এর কারণ এই যে, তারা মনে করেন যে, হিজাযবাসীরা

দৃঢ়ভাবে হাদীস সংরক্ষণ করেছেন এবং কোনো হাদীসেই তাদের সংরক্ষণ হতে পরিত্যক্ত হয় নি। পক্ষান্তরে, ইরাকবাসীদের হাদীসের মধ্যে অসংরক্ষণতা বা অস্থিরতা বিদ্যমান। সুতরাং এগুলো সম্পর্কে মৌনতা অবলম্বন করা উচিৎ। কোনো কোনো ইরাকবাসীর অভিমত হলো, সিরীয়দের বর্ণিত হাদীস দলীল হতে পারে না।

যদিও অধিকাংশ লোক এ কারণে হাদীসকে দুর্বল গণ্য না করার পক্ষেই মত দিয়েছেন। সুতরাং হাদীস হিজাযী, ইরাকী অথবা শামী কিংবা অন্য যে কোনো দেশীয় হোক না কেন, সনদ (Chain of Narration) ঠিক হলে ঐ হাদীস দলীল হবে।

আবু দাউদ আস-সিজিসতানী রহ. বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের বর্ণিত ভিন্ন ভিন্ন একান্ত যে সকল সুন্নাত রয়েছে (যেগুলো অন্য অঞ্চলের লোকেরা বর্ণনা করে নি) সেগুলোকে গ্রন্থনা করে একটি কিতাব লিখেছেন। উক্ত কিতাবে তিনি প্রতি অঞ্চল যেমন, মদিনা, মক্কা, তায়েফ, দামেস্ক, হিমস, কুফা, বসরা ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকার লোকদের এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন যা অন্য অঞ্চলের লোকদের কাছে সনদসহ বর্ণিত হয় নি। হাদীসের দুর্বল হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে আমল না করার এছাড়াও আরও কতগুলো কারণ রয়েছে।

চতুর্থ কারণ

কোনো কোনো ইমাম কর্তৃক খবরে ওয়াহিদ (মুতাওয়াতির কিংবা মাশহূর নয় এমন হাদীস) এর বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ ও স্মরণশক্তির অধিকারী হওয়ার পরও তাতে এমন কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া, যাতে

অন্যরা তার বিরোধিতা করে থাকে। (অর্থাৎ খবরে ওয়াহেদ বিশুদ্ধ ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হওয়া সত্বেও তার ওপর আমল করার জন্য কিছু শর্ত দেওয়া। অথচ অন্য ইমামদের নিকট এ সব শর্ত ধর্তব্য নয়। সুতরাং শর্ত আরোপকারী ইমাম সে সকল খবরে ওয়াহেদের ওপর আমল না করলেও অন্য ইমামগণ ঠিকই আমল করেছেন। তাই শর্তারোপ করা সে হাদীসের ওপর আমল না করার কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে।) যেমন,

ক. তাদের কেউ শর্ত করেছেন যে, সে খবরে ওয়াহেদকে কুরআন ও অন্যান্য হাদীসের সামনে পেশ করতে হবে। (অর্থাৎ কুরআন ও খবরে মুতাওয়াতির অনুযায়ী হয়েছে কী না তা দেখতে হবে, নতুব গ্রহণযোগ্য নয়)।

খ. আবার কেউ শর্ত করে বলেন, খবরে ওয়াহেদের বর্ণনাকারী ফকীহ হতে হবে, যখন ঐ হাদীস মূলনীতিসমূহের কিয়াসের বিরোধী হবে।

গ. আবার কেউ কেউ শর্ত দিয়ে বলেন, খবরে ওয়াহেদ গ্রহণের জন্য শর্ত হচ্ছে তা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে হবে, বিশেষ করে ঐ হাদীস যখন মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সব সময় প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আরও বিভিন্ন শর্ত কেউ কেউ আরোপ করে থাকেন। এ সম্পর্কিত আলোচনা যথাস্থানে বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত।

পঞ্চম কারণ

হাদীসটি ইমামের নিকট পৌছেছে এবং তার নিকট তা রাসূলের হাদীস বলে প্রমাণিতও হয়েছে, কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন। এটা কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টির ব্যাপারেই হতে পারে। যেমন, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হলো, সফরের সময় কোনো ব্যক্তি নাপাক হলে এবং তখন পানি না পাওয়া গেলে সালাত আদায় করতে হবে কী না? তিনি বললেন, সফরের সময় কোনো ব্যক্তি নাপাক হলে, পানি না পাওয়া পর্যন্ত তাকে সালাত আদায় করতে হবে না। তখন আম্মার ইবন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার কি সেই কথা স্মরণ আছে, যখন আপনি ও আমি উটের দলের মধ্যে ছিলাম এবং আমরা নাপাক হয়েছিলাম। অতঃপর আমি পশুর মতো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে উঠলাম এবং সালাত আদায় করলাম। কিন্তু আপনি সালাত আদায় করলেন না। তৎপর এ ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করলাম। তখন তিনি বললেন: তোমার জন্য এভাবে করাই যথেষ্ট হতো বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুহাত মাটিতে মারলেন। অতঃপর দু’হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও কব্জিদ্বয় মাসেহ করলেন। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আম্মার! আল্লাহকে ভয় কর। আম্মার বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে আমি হাদীসটি বর্ণনা করব না। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, যার দায়িত্ব তুমি নিয়েছ, আমরাও সে বিষয়ে অনুমোদন দিচ্ছি।[21]

---

[21] সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ।

এ সুন্নাতটি সংঘটিত হওয়ার সময় উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি হাদীসটি এমনভাবে ভুলে যান যে, তার বিপরীত রায় প্রকাশ করেন এবং আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি স্মরণ করতে পারেন নি। তিনি আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মিথ্যুক বলেন নি, বরং হাদীসটি বর্ণনা করার আদেশ দেন।

এ বিষয়ে উপরোক্ত ঘটনা থেকে এটা আরও বেশি প্রমাণবহ[22] ঘটনা হলো, "একবার উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু খুৎবায় বললেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ও মেয়েদের মহর থেকে যে কোনো ব্যক্তির অতিরিক্ত মহরকে আমি রদ করবো। তখন একজন স্ত্রীলোক বললেন, হে উমার! আল্লাহ স্বয়ং যা আমাদেরকে দান করেছেন তা হতে আপনি কেমন করে বঞ্চিত করবেন? অতঃপর দলীল হিসেবে এই আয়াত পাঠ করলেন:

﴿وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠﴾ [النساء: ٢٠]

"তোমরা স্ত্রীদের কাউকেও ভারী (Standard of weight) মহরানা দিয়ে থাকলে তাদের নিকট হতে কিছু ফিরত নিও না"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২০] (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)[23]।

[22] কারণ, আগত ঘটনাতে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কুরআনের আয়াতও ভুলে গিয়েছিলেন। [সম্পাদক]

[23] তবে বর্ণনাটির সনদ দুর্বল। [সম্পাদক]

অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রীলোকটির কথায় সম্মতি দিলেন এবং নিজের কথা উঠিয়ে নিলেন।” অথচ, উমারের রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়াতটি মুখস্থ ছিল। কিন্তু তিনি তা ভুলে গিয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এরূপ একটি হাদীস। উষ্ট্র যুদ্ধের (War of Camels) সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদা সম্পর্কে কিছু স্মরণ করালেন। জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কথা স্মরণ হলে তিনি যুদ্ধ হতে বিরত থাকলেন।[24]

এ ধরণের ঘটনা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সালাফে সালেহীনের মধ্যে বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

ষষ্ঠ কারণ

হাদীসে আমল না করার কারণ এও হয়ে থাকে যে, ইমাম বা আলিম ব্যক্তি হাদীসের চাহিদা বা ইঙ্গিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকবেন বা জানবেন না। আর যে ব্যক্তি হাদীসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত, তার ঐ হাদীসে আমল করার প্রশ্নই উঠে না। বেশ কয়েকটি কারণে হাদীসের উদ্দেশ্য একজন ইমাম বা আলিমের কাছে অজানা থাকতে পারে। যেমন,

---

[24] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, বায়হাকী, মুসান্নাফে আবদির রাযযাক।

ক. কখনও কখনও হাদীসে উল্লিখিত শব্দটি অপরিচিত কোনো শব্দ হয়ে থাকে। যেমন, নিম্নোক্ত শব্দসমূহ:

১. ‘মুযাবানাহ’[25]

২. ‘মুখাবারাহ’[26]

৩. ‘মুহাকালাহ’[27]

৪. ‘মুলামাসাহ’[28]

৫. ‘মুনাবাযাহ’[29]

৬. ‘গারার’[30] ইত্যাদি কদাচিৎ ব্যবহৃত শব্দগুলো, যার মধ্যে আলিমগণ কখনও কখনও এসব শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে থাকেন।

তাছাড়া কদাচিৎ অর্থে ব্যবহৃত শব্দের উদাহরণ নিম্নের মারফু‘ হাদীসেও পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে,

---

[25] গাছের ঝুলন্ত খেজুর অন্যত্র শুকনা খেজুরের পরিবর্তে বিক্রি করা।

[26] ভূমিতে অর্জিত শস্যের বিশেষ অংশের তৃতীয় বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে কাজ করা।

[27] শীষের অভ্যন্তরস্থিত গমকে বাইরের পরিস্কার গমের বিনিময়ে বিক্রয় করা।

[28] বিক্রেতা বলবে: আমার কাপড় স্পর্শ করলে বেচা-কেনা অবশ্যম্ভাবী অথবা ক্রেতা বলবে, আমি তোমার কাপড় স্পর্শ করলেই বেচা-কেনা সম্পূর্ণ হবে।

[29] কোনো ব্যক্তি বিক্রেতাকে এই কথা বলা যে, আমি তোমার দিকে এই প্রস্তর টুকরা নিক্ষেপ করলেই বিক্রয়া সম্পূর্ণ হবে।

[30] ধোকাপূর্বক ক্রয় বিক্রয় অর্থাৎ দ্রব্যের উপরের অংশ দেখে ক্রেতা মুগ্ধ হয় এবং ধোকা প্রাপ্ত হয় কিন্তু ভিতরগত বস্তু সম্পর্কে সে অনভিহিত।

«لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»

এখানে إِغْلَاق শব্দের তফসীর আলিমগণ إكراه বা জবরদস্তি করেছেন[31]। আর সে হিসেবে তারা জবরদস্তি স্ত্রী তালাক ও দাসের স্বাধীনতা নিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মত দিয়েছেন, কিন্তু যারা এ মতের বিপরীত মত পোষণ করেন, তারা এ তাফসীরটি জানেন না।

খ. আবার কখনও উক্ত ইমাম বা আলিমের জন্য সে হাদীসের অর্থ না জানার কারণ হচ্ছে, যে শব্দ হাদীসে এসেছে, তার বর্তমান আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোনীত অর্থের বিপরীত হওয়া। কারণ সম্ভবত সে ইমাম বা আলিম শব্দটির সে অর্থই করবে যা সে বর্তমানে বুঝে। সে মনে করছে যে বর্তমানে প্রচলিত শব্দটির অর্থই রাসূলের উদ্দেশ্য। কেননা শব্দের অর্থ সব সময় এক হওয়াই হচ্ছে মৌলিক নীতি। (অথচ সময়ের পরিবর্তনে শব্দটির অর্থে পরিবর্তন এসেছে, রাসূলের যুগে যে অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়েছিল বর্তমানে হয়ত সে অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না, ফলে উক্ত ইমাম বা আলিম রাসূলের উদ্দেশ্য না বুঝে শব্দটি থেকে বর্তমানে প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেছে। আর এভাবেই তিনি প্রকৃতপক্ষে হাদীসটির অর্থ বুঝতে অক্ষম হলেন।) যেমন,

---

[31] তখন হাদীসের অর্থ দাঁড়ায়, (কারও নিকট হতে জোরপূর্বক তালাক নেওয়া হলে এবং জোরপূর্বক কারও গোলাম আযাদ করা হলে ঐ স্ত্রীর প্রতি তালাকও পতিত হবে না এবং ঐ গোলামও আযাদ হবে না।) [মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ ও ইবন হিব্বান]।

কেউ বিভিন্ন বর্ণনা থেকে শুনল যে, (মদ হারাম হলেও) ‘নাবীয’ এর ব্যাপারে ‘রুখসত’ বা ছাড় দেওয়া হয়েছে। তখন সে মনে করল যে, ‘নাবীয’ সম্ভবত কোনো এক প্রকার মাদক। কারণ সে তার ভাষাতেই এরূপই বুঝে থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে, খেজুর মিশ্রিত মিষ্টি পানিকেই নাবীজ বলা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত ওতে নেশা না আসে। অনেক সহীহ হাদীসেই নাবীযের এরূপ ব্যাখ্যা এসেছে।

অনুরূপভাবে কেউ কেউ কুরআন ও সুন্নায় উদ্ধৃত ‘খমর’ শব্দটি শুনতে পেল। তখন তারা মনে করল যে, ‘খমর’ বলতে শুধুমাত্র আংগুরের রসকেই বুঝায়; যখন তা শক্ত ও নেশাযুক্ত হয়। কেননা এটাই ‘খমর’ বা মদের আভিধানিক অর্থ। যদিও অনেক সহীহ হাদীসে প্রত্যেক নেশাযুক্ত পানীয়কেই মদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে[32]। (সুতরাং এখানেও সে ব্যক্তি যে মদ বলতে শুধু আংগুরের রস বুঝেছে, সে ভুল করেছে। সে ভুলের কারণ হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহর শব্দকে রাসূলের যুগের ব্যবহৃত অর্থের বিপরীতে অথবা হাদীসের স্বীকৃত অর্থ বাদ দিয়ে বর্তমান কালের আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা। সুতরাং হাদীসের সঠিক অর্থ না জানা থাকার এটাও একটি কারণ।)

গ. আবার কখনও উক্ত ইমাম বা আলিমের জন্য সে হাদীসের অর্থ না জানার কারণ হচ্ছে, হাদীসের শব্দ মুশতারাক (একই শব্দের কয়েকটি অর্থ থাকা) কিংবা মুজমাল (সংক্ষিপ্ততাজনিত অস্পষ্টতা) থাকা অথবা শব্দটি হাকীকত (তথা প্রকৃত) ও মাজায (অন্যার্থবোধক) অর্থের মধ্যে

[32] সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এ সংক্রান্ত হাদীস রয়েছে।

ঘূর্ণায়মান থাকা। এমতাবস্থায় সে ইমাম বা আলিম শব্দের তার নিকটস্থ অর্থ গ্রহণ করে, যদিও অন্যটাই সেখানে উদ্দেশ্য।

যেমন, সাহাবীগণের এক দল প্রথমতঃ কুরআনুল কারীমের ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] আয়াতে الخيط الأبيض এবং الخيط الأسو "সাদা এবং কালো সুতা"-কে "রশি" অর্থে ব্যবহার করেছেন[33]।

অনুরূপভাবে কেউ কেউ আল্লাহর বাণী, ﴿فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم﴾ [المائدة: ٦] "তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ কর" এই আয়াতের أَيۡدِيكُم "তোমাদের হাত" শব্দ দ্বারা হাতের বগল পর্যন্ত অর্থে ব্যবহার করেছেন।

ঘ. আবার কখনও উক্ত ইমাম বা আলিমের জন্য সে হাদীসের অর্থ না জানার কারণ হচ্ছে, কুরআনের আয়াত বা হাদীসের শব্দের 'চাহিদা বা উদ্দেশ্যে' গুপ্ত থাকা[34]। কেননা কোন কথার কী 'চাহিদা বা উদ্দেশ্য', তা অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়; সেটা উপলব্ধি ও কথার বিভিন্ন দিক বুঝার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বিরাট তফাৎ হয়ে থাকে। কারণ, এ ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও বুঝ সবার জন্য সমান নয়।

---

[33] আদী ইবন হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণনা দেখুন, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ। [সম্পাদক]

[34] অর্থাৎ শব্দ দ্বারা কিসের ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা স্পষ্ট না থাকা। [সম্পাদক]

আবার হতে পারে, ‘নস’ বা ভাষ্যে ব্যবহৃত সেই বাক্যের ‘চাহিদা ও উদ্দেশ্য’ সংক্রান্ত সাধারণ একটি অর্থ সেই ব্যক্তি (ইমাম) এর জানা রয়েছে; কিন্তু উক্ত ‘নস’ বা ভাষ্য দ্বারা প্রকৃত যে ‘চাহিদা বা উদ্দেশ্য’ রয়েছে, সেটা তার জানা (সাধারণ) অর্থের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে তাঁর মনেই হয় নি[35]।

আবার হতে পারে, এটা যে নস (বা কুরআন, হাদীস) এর ভাষ্যের চাহিদা ও উদ্দেশ্য সেটা সে ব্যক্তি (ইমাম) এর জানা ছিল, কিন্তু পরে তিনি তা ভুলে যান। এও একটি বিরাট অধ্যায়। আল্লাহ ছাড়া কারও পক্ষে তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

আবার হতে পারে, ‘নস’ বা ভাষ্যে ব্যবহৃত সেই বাক্যের ‘চাহিদা ও উদ্দেশ্য’ বিষয়ে সেই ব্যক্তি (ইমাম) ভুল করে থাকবেন। ফলে তিনি বাক্যকে এমন অর্থে ব্যবহার করবেন, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরিত আরবী ভাষায় প্রমাণিত হয় না।

---

[35] অর্থাৎ তার (ইমামের) মনেই হয় নি যে, হাদীসের নস বা ভাষ্যের প্রকৃত অর্থ, তার জানা হাদীসের সাধারণ অর্থের আওতাভুক্ত। ফলে তিনি হাদীসের ‘নস’ বা মূল ভাষ্যের চাহিদা সাধারণভাবে জানলেও, সেটার প্রকৃত অর্থ তার জানা সাধারণ অর্থের আওতায় আসবে বলে তার মনের কোনেই উদিত হয় নি। তিনি সে প্রকৃত অর্থটি হাদীসের বাক্যের চাহিদার মধ্যে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে সাবধান হন নি। [সম্পাদক]

সপ্তম কারণ

হাদীসে আমল না করার কারণ কখনও কখনও এও হয়ে থাকে যে, ব্যক্তি বা ইমাম মনে করেন, উল্লিখিত হাদীসটির মধ্যে আলোচ্য বিষয়টি উদ্দিষ্ট নয়।

এই কারণ ও পূর্ববর্ণিত কারণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটির মধ্যে সেই ব্যক্তি বা ইমাম হাদীসের প্রকৃত চাহিদা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকবেন। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে (অর্থাৎ সপ্তম এই কারণে) সেই ব্যক্তি বা ইমাম হাদীসের চাহিদা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানবেন বা জ্ঞাত থাকবেন। কিন্তু তার বদ্ধমূল ধারণা যে, (হাদীস থেকে) এই চাহিদা ও উদ্দেশ্য নেওয়া সঠিক নয়। কেননা সেই ব্যক্তি বা ইমামের যে সব সুনির্দিষ্ট উসূল বা মূলনীতি রয়েছে সেগুলোর বিপরীত হওয়ায় এই উদ্দেশ্য বা চাহিদা পরিত্যাজ্য। চাই ইমাম বা ব্যক্তির সে সব মূলনীতি প্রকৃত অর্থে সঠিক হোক অথবা ভ্রান্ত হোক।

যে সব মূলনীতির বিপরীত হলে কখনও কখনও মুজতাহিদ ব্যক্তি ইমাম হাদীসের ওপর আমল করা থেকে বিরত থাকেন, সেসব কিছু মূলনীতির[36] উদাহরণ:

---

[36] এসব মূলনীতি শুদ্ধও হতে পারে, আবার অশুদ্ধও হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ইমাম বা মুজতাহিদ ব্যক্তি মনে করছে যে, এগুলো অভ্রান্ত নীতি। সুতরাং এর বিপরীতে হাদীসের কোনো চাহিদা পাওয়া গেলে সেসব হাদীসের উপর আমল করতে হবে মূলনীতির আলোকে, বিপরীতে গিয়ে নয়। তাই প্রয়োজনে তাঁরা সেসব

১. মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমাম বিশ্বাস করবে যে, কোনো ‘আম’ বা সাধারণ বিধানকে যখন কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়, তখন সে সাধারণ নির্দেশ তার কার্যকারিতা হারায় বিধায় সেটা আর দলীল-প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় না।

২. কোনো নির্দেশ থেকে (বিপরীত) বোধগম্য বিষয়কে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না[37]।

৩. কোনো কারণের ওপর অর্পিত সাধারণ হুকুম ঐ কারণের ওপরই সীমিত থাকবে।

হাদীসের ভিন্ন ব্যাখ্যাও দিয়ে থাকেন। আবার কখনও কখনও আমলের উপযোগীই মনে করেন না। [সম্পাদক]

[37] এটি একটি উসূলী পরিভাষা। এটি বুঝতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বুঝতে হবে: যে কোনো নস বা ভাষ্য থেকে নির্দেশনা দু’ ধরণের হয়ে থাকে। ১. মানতূক বা কথিত। ২. মাফহূম বা বোধিত।

১- কোনো নির্দেশ সরাসরি যে বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, সেটাকে বলা হয়, মানতূক। বা কথিত বিষয়। সেটি আবার দু’ প্রকার। এক. সরাসরি কথিত, দুই. কথিত হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

২- কোনো নির্দেশ থেকে বোঝা যায়, সেটাকে বলা হয়, মাফহূম। বা বোধিত বিষয়। এটা আবার দু’ প্রকার। এক. নির্দেশের পক্ষে বোধিত। (যাকে মাফহূমে মুওয়াফিক বলে) দুই. নির্দেশের বিপরীত অংশে যেখানে কোনো বিধান নেই, সেটাতে নির্দেশ থেকে বোধিত বিধানের বিপরীত বিধান প্রদান করে। (যাকে মাফহূমে মুখালিফ বলে)। উপরোক্ত সকল প্রকারই আলেমদের নিকট বিধান হিসেবে গৃহীত। তবেএ দ্বিতীয় বোধিত বিষয়টিতে কোনো কোনো ইমাম মতভেদ করে বলেছেন, যে ব্যপারে শরী‘আত চুপ রয়েছে সেখানে কোনো বিধান দেওয়া যাবে না। ইমাম ইবন তাইমিয়্যা এ মতটিকেই এখানে তুলে ধরেছেন। [**সম্পাদক**]

৪. কোনো প্রকার হেতু উল্লেখমুক্ত নির্দেশ দ্বারা ওয়াজিব হওয়া বুঝাবে না।

৫. কোনো প্রকার হেতু উল্লেখমুক্ত নির্দেশ দ্বারা তাৎক্ষনিক হওয়া বাধ্য করে না।

৬. কোনো শব্দে ‘আলিফ লাম’ যুক্ত করা দ্বারা নির্দিষ্ট’ করা হলে সেটা দ্বারা অনির্দিষ্ট বুঝার সুযোগ থাকে না।

৬. কোনো ‘না’ বোধক ক্রিয়া দ্বারা সে বস্তুর অস্তিত্ব কিংবা তার যাবতীয় হুকুমই না হয়ে যায় না।

৭. কোনো নস বা ভাষ্যের চাহিদাকে সাধারণ করে দেওয়া যাবে না, সুতরাং মর্মার্থ ও অর্থের মধ্যে সাধারণত্ব আনা যাবে না।

ইত্যাদি অন্যান্য মূলনীতিসমূহ, যাতে বিশদ আলোচনা ও মতামতের অবকাশ রয়েছে[38]।

---

[38] অর্থাৎ এ সকল উসূল বা মূলনীতি হয়ত, সে মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমামের কাছে অলঙ্ঘনীয় মূলনীতি। যা তিনি বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের আলোকে নির্ধারণ করেছেন। অথচ অন্য মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমামের নিকট এগুলোর কোনো কোনোটি ধর্তব্য নয়, অথবা ব্যতিক্রম হতে পারে বলে স্বীকৃত। সুতরাং কোনো কোনো মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমাম কোনো হাদীসের উপর আমল করার সময় হয়ত এসব মূলনীতির বিপরীত দেখতে পেয়ে সেটার উপর আমল করেন নি। অথচ অন্য ইমামের নিকট হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ায় সেটা নিজেই একটি মূলনীতি বিবেচিত হওয়ায় সেটার উপর তিনি আমল করেছেন। আর এভাবেই মতপ্রার্থক্যের সূত্রপাত ঘটে।

বস্তুতঃ কোনো হাদীসের ওপর আমল না করার জন্য উক্ত কারণটি এতই ব্যাপক যে, "উসূল-ই-ফিকহ"-এর বিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোর প্রায় অর্ধেকই এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও শুধু উছুল বা কায়দা বিরোধপূর্ণ 'দালালাত তথা চাহিদার সবগুলিকে শামিল করে না।

এ ছাড়াও উক্ত কারণটির মধ্যে কোনো একটি অর্থ ভাষ্যে বর্ণিত বাক্যের চাহিদা ('দালালাত') এর শ্রেণীভুক্ত হবে কি না, এটা নির্ধারণ করাও এ কারণটির অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। যেমন কোনো ইমাম বিশেষ কোনো হাদীসের ওপর এ জন্য আমল করেন না যে, এর মধ্যস্থিত উদ্দিষ্ট শব্দটি মুজমাল, যার অর্থ 'মুশতারাক' বা দ্ব্যর্থবোধক, সেখানে এমন কোনো প্রমাণও নেই যা এর একটি অর্থকে নির্ধারণ করে দিবে। (সুতরাং তিনি সেটা নির্ধারণ না করা জনিত কারণে সেটার ওপর আমল করেন নি) ইত্যাদি। (আরও এ জাতীয় শাখা কারণগুলোও এ মৌলিক সপ্তম কারণের অন্তর্ভুক্ত।)

সুতরাং কেউই রাসূলের হাদীসকে আমল না করার ব্যাপারে মত দেন নি; বরং ইজতেহাদগত কারণেই তাদের মধ্যে মত প্রার্থক্য ঘটেছে। [সম্পাদক]

অষ্টম কারণ

হাদীসে আমল না করার একটি কারণ এও হয়ে থাকে যে, হাদীসটি যে মাসআলার জন্য দলীল হিসেবে পেশ করা হয়, সেটার বিপক্ষে এমন দলীলও রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, হাদীসটি উক্ত মাসআলার দলীল নয়। যেমন,

ক. অনির্দিষ্ট (عام) দলীলটি নির্দিষ্ট (خاص) দলীলের বিরোধী হওয়া।

খ. অথবা শর্তমুক্ত (مطلق) দলীলটি শর্তযুক্ত (مقيد) দলীলের বিরোধী হওয়া।

গ. অথবা শর্ত-মুক্ত নির্দেশ (الأمر المطلق) টি এমন কিছুর বিপরীত হওয়া, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, নির্দেশটি ওয়াজিবের আওতাভুক্ত নয়।

ঘ. অথবা, প্রকৃত (حقيقة) অর্থের সাথে অপ্রকৃত (مجاز) অর্থের দ্বন্দ্ব হওয়া। এছাড়া আরও বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দ্বযুক্ত মাসআলা রয়েছে, যা একটি বিস্তৃত অধ্যায়।

কেননা বাক্যের চাহিদা ও উদ্দেশ্য দ্বন্দ্বতাপূর্ণ হওয়া, আর সেগুলোর একটির ওপর অন্যটির প্রাধান্য দেওয়া সহজ কাজ নয়। এটা অসীম সাগরের ন্যায় অত্যন্ত ব্যাপক অধ্যায়।

নবম কারণ

এ ধারণা করা যে, হাদীসটি এমন কিছুর সাথে দ্বন্দ্বযুক্ত, যা সবার নিকটই বিপরীতে দাঁড়ানোর ক্ষমতার রাখে। যেমন, অপর কোনো

আয়াত অথবা অপর কোনো হাদীস অথবা ইজমা‘-এর মতো শক্তিশালী প্রমাণ। (যদি এ ধরণের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, তখন) তা প্রমাণ করে যে, (যে হাদীসটির ওপর মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমাম আমল করেন নি সে) হাদীসটি হয় দুর্বল, নয়তো রহিত কিংবা তাতে তাবিল তথা ব্যাখ্যা (Interpretation) রয়েছে; যদি তাতে তাবিল তথা ব্যাখ্যা করে ভিন্ন অর্থ করার অবকাশ থাকে।

এ প্রকার কারণ দু’ভাগে বিভক্ত

১. প্রথমত: ধারণা করা যে, এ হাদীসের বিপরীতটি (এ হাদীসের ওপর) মোটামুটিভাবে প্রাধান্য প্রাপ্ত। সুতরাং এ হাদীসটি দুর্বল অথবা রহিত অথবা তাবিল তথা ব্যাখ্যা করে ভিন্ন অর্থ করা এ তিনটির কোনো একটি অনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হবে।

২. দ্বিতীয়ত: উপরোক্ত সম্ভাবনাগুলোর মধ্যকার কোনো একটিকে নির্ধারণ করা। যেমন, এটা বিশ্বাস করা যে, হাদীসটি রহিত অথবা তাবিল তথা ব্যাখ্যা করে ভিন্ন অর্থকৃত।

তারপর হয়ত (সে মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমাম কর্তৃক) হাদীসকে রহিত বলার ক্ষেত্রে (তিনি) ভুল-ত্রুটি করে থাকবেন। যেমন, কখনও পরবর্তী হাদীসকে (যা রহিত হওয়া দরকার সেটাকে ভুলবশতঃ) পূর্ববর্তী হাদীস (যা রহিত হওয়ার উপযুক্ত) বলে মনে করবেন।

আবার কখনও সে মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমাম হাদীসটির তাবিল তথা ভিন্ন অর্থ করার ক্ষেত্রে ভুল করে বসেন। ফলে হাদীসকে এমন অর্থে

ব্যবহার করেন যে অর্থ তার শব্দের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। অথবা হাদীসের মধ্যেই এমন কোনো কিছু পাওয়া যাবে যা হাদীসের এ অর্থ করাকে প্রত্যাখ্যান করে।

তাছাড়া (আরও একটি দিক এখানে প্রণিধানযোগ্য, তা হচ্ছে) যখন কোনো হাদীসের বিপরীতে অন্য হাদীসকে মোটামুটিভাবে দ্বান্দ্বিক বলে ধরে নেওয়া হয়, তখন কখনও কখনও (অবস্থা এমনও হতে পারে যে) বিপরীত হাদীসটিতে এমন ভাবধারা পাওয়া যায় না, যার জন্য তাকে বিপরীতধর্মী (দ্বান্দ্বিক) হাদীস বলা যায়। আবার কখনও কখনও এরূপও হয়ে থাকে যে, হাদীসটি বিপরীতধর্মী হলেও সনদ (Chain of Narration) ও মতনের (Text) দিক দিয়ে এবং সঠিকতার দিক দিয়ে তা প্রথম হাদীসটি[39]র চেয়ে নিম্ন স্তরের। আর তাতেই (দ্বিতীয় হাদীসটিতেই) বরং (আমল না করার) সে সকল কারণ ও সম্ভাবনাগুলো আপতিত হয়, যা প্রথম হাদীসে (কোনো ইমাম বা মুজতাহিদ কর্তৃক প্রথমে) আপতিত করা হয়েছিল।

তদ্রুপ (আরও একটি দিক এখানে প্রণিধানযোগ্য, তা হচ্ছে) যে মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমাম ইজমা‘কে হাদীসের বিপরীত হয়েছে দাবী করে হাদীসের ওপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছে, সেটা মূলত ইজমা‘ নয়। বরং তার কথা বা দাবীর ভিত্তি হচ্ছে এই যে, এর বিপরীত মত

---

[39] যে হাদীসটির উপর মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমাম আমল করেন নি এ কারণে যে এর বিপরীতে হাদীস রয়েছে, সে হাদীসটিই মূলতঃ শক্তিশালী, তার বিপরীতটি দুর্বল। অথচ মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমাম তা বুঝতে পারেন নি। [সম্পাদক]

কারও কাছ থেকে জানা যায় না। নাম করা আলিমগণের অনেকেই এমন কিছু মত গ্রহণ করেছেন, যে মতের সপক্ষে তাদের একমাত্র দলীল হচ্ছে, এর বিপরীত মত কারও কাছ থেকে জানা না থাকা। যদিও তাদের কাছে এ ব্যাপারে এমন প্রকাশ্য দলীর প্রমাণাদি রয়েছে, যা তাদের মতের বিপরীত কথাকেই সাব্যস্ত করছে।

তবে কোনো আলিমের এটা উচিত নয় যে, তিনি কোনো মতের সপক্ষে পূর্বে কোনো প্রবক্তা আছে কি না তা না জেনে একটি মত দিয়ে দিবেন; বিশেষ করে যখন তিনি জানবেন যে, মানুষ এর বিপরীত মতটিই দিয়েছে। আর এজন্যই কোনো কোনো আলিম মত প্রকাশের সময় বলতেন, "যদি এ মাসআলাটির ব্যাপারে ইজমা' বা সর্বসম্মত রায় থাকে তবে তা অবশ্যই অনুসরণযোগ্য। অন্যথায় ইজমা' না থাকলে তাতে আমার মত হচ্ছে এরূপ বা ওরূপ[40]।

---

[40] এ প্যারাটুকু আগের ও পরের কথা থেকে ভিন্ন করে বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, মানুষ যেন নিজে নতুন মত আবিস্কার করতে উদ্বুদ্ধ না হয়। সে যেন কোনো মত দেওয়ার আগে তার মতের সপক্ষে সালফে সালেহীনের কেউ বলেছে কী না সেটা দেখে নিশ্চিত হয়। কারণ হতে পারে সে এমন মত দিচ্ছে, যা আর কেউই কখনও দেয় নি, আর তাতে দ্বীনের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তাকে অবশ্যই কোনো বিষয়ে মত দেয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে যে, অন্ততঃ তার কথার সপক্ষে সালফে সালেহীনের একজন হলেও বলেছেন। আবার কখনও কখনও এমনও হতে পারে যে নিজে নিজের পক্ষ থেকে মত দিতে গিয়ে ইজমা' এর বিপরীত মত দিয়ে ফেলেছে। আর এ জন্যই আলেমগণ ইজমা না হওয়ার শর্তযুক্ত করে কখনও কখনও মত প্রদান করতেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। [সম্পাদক]

এর[41] উদাহরণ: কেউ বললেন, আমি জানি না কেউ ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন কী না[42]। অথচ তাদের সাক্ষী কবুল হওয়ার ব্যাপারে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও শুরাইহ রহ. থেকে বর্ণনা রয়েছে[43]।

একইভাবে অন্য কোন আলিম বলেন, আংশিক আযাদকৃত ক্রীতদাসের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকার) না হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। পক্ষান্তরে, তাদের ওয়ারিশ হওয়া সম্পর্কে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা রয়েছে। আর এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও একটি হাসান হাদীস বর্ণিত আছে[44]।

---

[41] এ উদাহরণ পূর্বের প্যারার সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং পূর্বের প্যারার পূর্বের প্যারার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ বিপরীত মত না জানাকে কেউ কেউ কীভাবে ইজমা‘ বলে চালিয়ে দিয়েছে, অথচ সেটা ইজমা নয়, তারই উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। [সম্পাদক]

[42] এ কথাকেই তিনি হয়ত ইজমা‘ ধরে নিয়েছেন। কারণ, তিনি এর বিপরীত মত জানেন না। বস্তুত: বিষয়টি ইজমা নয়। কারণ, এর বিপরীত মত রয়েছে। যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে। [সম্পাদক]

[43] অর্থাৎ তারা এটা জায়েয বলেছেন। সুতরাং তার না জানা ইজমা‘ হিসেবে ধর্তব্য হবে না। আর এটার দোহাই দিয়ে হাদীসের উপর আমল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। যদিও কোনো ব্যক্তি বা মুজতাহিদ সেটার কারণে ভুল করে হাদীসের উপর আমল ছেড়ে দিয়ে থাকেন। সেটা তার ইজতেহাদী ভুল হিসেবে বিবেচিত হবে।[সম্পাদক]

[44] হাদীসটির শব্দ হচ্ছে, «الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» অর্থাৎ মুকাতাব বা স্বাধীন হওয়ার জন্য বিনিময় প্রদানে চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস যতটুকু প্রদান করবে, ততটুকু পরিমাণ স্বাধীন হবে, যতটুকু

অন্য একজন বলেন, আমার জানা নেই যে, সালাতের মধ্যে রাসূলের ওপর দুরূদ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি কোনো আলিমের মত। অথচ এই দুরূদ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে আবু জা'ফর বাকের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সংরক্ষিত বর্ণনা রয়েছে[45]।

সুতরাং এ ধরনের ইজমা দাবী করার বিষয়টি এরূপ হয়ে থাকে যে, কোনো কোনো আলিম তার দেশবাসী আলিমগণের মত জানাই তার জন্য সর্ব্বোচ্চ সীমা মনে করেছে, ফলে সে অন্যান্য দেশীয় আলিমদের মত সম্পর্কে অজ্ঞ রয়ে গেছে[46]।

স্বাধীন হয়েছে, সে পরিমাণে তার ওপর অপরাধের হদ বা শাস্তি প্রযোজ্য হবে, আর যতটুকু স্বাধীন হয়েছে, ততটুকু ওয়ারিশ হবে। (নাসাঈ, হাদীস নং ৪৮১১; অনুরূপ, তিরমিযী, হাদীস নং ১২৫৯; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৫৮২) হাদীসটি একটি সহীহ হাদীস। যার ওপর ইমাম আবু হানিফাসহ কেউ কেউ আমল করেন নি। কারণ, তাদের মতে, এটি অন্য একটি হাদীসের বিপরীত, যেখানে বলা হয়েছে যে, মুকাতাবের যতক্ষণ একটি দিরহামও বাকী থাকবে, ততক্ষণ সে দাস হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু এটি মূলতঃ একটি মাওকূফ হাদীস। যা আয়েশা, যায়েদ ইবন সাবেত, ইবনে উমর সহ একদল সাহাবী থেকে বর্ণিত। [সম্পাদক]

[45] আর ইমাম শাফে'ঈ সহ একদল আলেম এ মতটি গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম রচিত জালাউল আফহাম ফিস সালাতি আলা খাইরিল আনাম আলাইহিস সালাত ওয়াসালাম। সুতরাং বিপরীত মত না জানাই ইজমা দাবীর করার জন্য যথেষ্ট নয়। [সম্পাদক]

[46] এভাবে তো আর ইজমা' হয় না। তাই যখন ইজমা' দাবী করা হয়, তখন যদি উদ্দেশ্য হয় যে, আমি এর বিপরীত মত সম্পর্কে জ্ঞাত নই, তখন সেটা ইজমা' বলে বিবেচিত হবে না। কারণ, অন্যান্য আলেমদের কাছে হয়ত এর বিপরীত মতটিই রয়েছে। আর হয়ত তাদের মতটিই বেশি শক্তিশালী। [সম্পাদক]

যেমনভাবে আমরা পূর্ববর্তী বহু আলিমগণকে দেখতে পাই- তারা শুধু মদিনা ও কুফাবাসী আলিমগণের রায় বা মতামতই জানতেন। এভাবে আমরা পরবর্তী বহু আলিমগণকে দেখি, তারা শুধু দুই তিনজন বিশিষ্ট আলিমের মতামত সম্পর্কে অবহিত। সেসব মতের বাইরে কোনো মত শুনলে তিনি সেটাকে ইজমার পরিপন্থী বলে মনে করতেন; কারণ, তিনি সেটার প্রবক্তা সম্পর্কে জানেন না। অথচ তার কানে ভিন্ন মতের কথা বারবার শোনানো হয়[47]।

এমনকি কোনো সহীহ হাদীস ঐ ইজমার বিপরীতে পাওয়া গেলেও তিনি সে হাদীসের ওপর আমল করার দিকে মত দিতে পারেন না, এই ভয়ে যেন তা (হাদীসের ওপর আমল করার বিষয়টি) ইজমার বিরোধী না হয়। কেননা ইজমা‘ বড় বা গুরুত্বপূর্ণ দলীল।

হাদীসে আমল না করার ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক লোকের ওযর এটাই হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে কতিপয় লোকের ওযর বাস্তবেই গ্রহণীয়, আবার কতিপয় লোকের জন্য তা ওযর বিবেচিত হলেও সেটা প্রকৃতপক্ষে ওযর নয়।

এভাবে হাদীসে আমল না করার আরও বহু ওযর আপত্তি পরিদৃষ্ট হয়।

দশম কারণ

---

47 অর্থাৎ তারপরও তিনি সেটা না শুনে ইজমা‘ হওয়ার দাবীই করে যেতেন। [সম্পাদক]

হাদীসে আমল না করার দশম কারণ এই যে, উক্ত হাদীসটির বিপক্ষে এমন কিছু দলীল-প্রমাণ রয়েছে, যার ফলে মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমাম মনে করেন যে, উক্ত হাদীস দুর্বল, মনসুখ (রহিত) অথবা তাতে তাবিল তথা ব্যাখ্যা করে ভিন্ন মত গ্রহণের অবকাশ রয়েছে। অথচ অন্যান্য ইমামগণ সেটাকে বা সেটার মত প্রমাণকে হাদীসের সাথে দ্বান্দ্বিক বলে মনে করেন না অথবা বাস্তবিকই সেই দলীল-প্রমাণকে ঐ হাদীসটির বিপরীতে গ্রহণযোগ্য দ্বান্দ্বিক মনে করার সুযোগ নেই।

যেমন, অনেক কুফাবাসী কোনো কোনো সহীহ হাদীসের বক্তব্যকে (ظاهر القرآن) কুরআনের ব্যাহ্যিক অর্থের[48] সাথে দ্বান্দ্বিক মনে করে থাকেন। কেননা তাদের বিশ্বাস এই যে, কুরআনের প্রকাশ্য দলীল কিংবা সাধারণ বক্তব্য বা অনুরূপ বিষয়, (نص الحديث) হাদীসের দালিলিক ভাষ্যের[49] ওপর প্রাধান্য পাবে।

---

[48] উসূলীদের পরিভাষায় এটাকে বলা হয়, যাহের। এর সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায়, যা সাধারণ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, অথচ তাতে ভিন্ন ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। [সম্পাদক]

[49] উসূলীদের পরিভাষায় এটাকে বলা হয়, ‘নস’। যার সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায়, যে উদ্দেশ্যে বাক্যটি নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে অন্য ব্যাখ্যার সুযোগ নেই। যেমন, আল্লাহর বাণী, ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: ٢٧٥] এখানে সাধারণ ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ বেচাকেনা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। কিন্তু ব্যাকটি যে উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়েছে, তা হচ্ছে, বেচাকেনা ও সুদের মধ্যে পার্থক্যকরণ। সুতরাং প্রথম অর্থটিকে বলা হয়, ‘যাহের’। আর দ্বিতীয় অর্থটিকে বলা হবে, ‘নস’। [সম্পাদক]

অতঃপর কখনো (সেসব মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমাম, যারা হাদীসের ওপর আমল করেন নি,) তারা যা প্রকৃত অর্থে যাহের (ظاهر) প্রকাশ্য নয়, তাকেই (ظاهر) প্রকাশ্য অর্থ বিশ্বাস করে (এবং এর সাথে হাদীসের মধ্যস্থিত (نص) কে দ্বান্দ্বিক মনে করে পরিত্যাগ করে থাকে) কেননা সাধারণত একই কথার মধ্যেই বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য নিহিত থাকে[50]।

- এ কারণেই অনেক কুফাবাসী 'একজন সাক্ষ্য ও দাবীদারের শপথ' এর মাধ্যমে বিচার করার সংক্রান্ত রাসূলের (القضاء بالشاهد واليمين) হাদীসটির ওপর আমল করেন নি[51]। যদিও তারা (কুফাবাসী) ব্যতীত অন্যান্যগণ জানেন যে, কুরআনের যাহের (ظاهر) বা প্রকাশ্য অর্থে 'এক সাক্ষী এবং দাবীদারের শপথ' এর মাধ্যমে বিচারকার্য সমাধা করার কোনো নিষেধাজ্ঞা

---

[50] সুতরাং হয়ত সে ইমাম বা মুজতাহিদ যেটাকে কুরআনের 'যাহের' অর্থ মনে করে হাদীসের 'নস' এর সাথে দ্বান্দ্বিক গণ্য করে হাদীসের উপর 'আমল ত্যাগ করেছে, আসলে কুরআনের সে অর্থটি যাহের নয়। বরং হাদীসের 'নস' এ যে অর্থটি এসেছে সেটাই কুরআনের 'যাহের' বা সেটাই কুরআনের 'নস'। কিন্তু মুজতাহিদ সেটা বুঝতে ভুল করেছেন। [সম্পাদক]

[51] অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাদীর নিকট দুইজন সাক্ষী না থাকলে, সে একজন সাক্ষী পেশ করার পর দ্বিতীয় সাক্ষীর স্থানে শপথ করবে। ফলে বাদীর পক্ষে রায় দেওয়া হবে। কুফাবাসীগণ ঐ হাদীসটি এজন্য কবুল করেন নি যে, কুরআনে দুই জন সাক্ষীর নির্দেশ রয়েছে।

নেই। এরূপ কিছু থাকলেও তাদের নিকট এটা (হাদীস) তাদের নিকট কুরআনের তাফসীররূপে গণ্য[52]।

আর ইমাম শাফে‘ঈ রহ. এ (কুরআনের আয়াতের যাহের (ظاهر) বা প্রকাশ্য অর্থ ও হাদীসের (نص) কে দ্বান্দ্বিক মনে করা সংক্রান্ত) ধারাটির ব্যাপারে যে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য দিয়েছেন, তা সর্বজন বিদিত[53]।

ইমাম আহমদ রহ.-এর বিষয়ে লেখা পুস্তিকাখানিও বেশ প্রসিদ্ধ, যাতে তিনি বিশদভাবে ঐ সব লোকের দাঁত ভাংগা জবাব দিয়েছেন, যারা মনে করে, প্রকাশ্য (যাহেরী) কুরআনের আয়াতই যথেষ্ট এবং হাদীসের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তিনি তার সে পুস্তিকাখানিতে তার বক্তব্যের সপক্ষে এমন অনেক দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছেন, কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব হলো না।

- হাদীসে আমল না করার যে কারণটি এখানে বর্ণিত হলো, (অর্থাৎ উক্ত হাদীসটির বিপক্ষে এমন কিছু দলীল-প্রমাণ থাকা,

---

[52] সুতরাং, হাদীসে কুরআনের যে তাফসীর বা ব্যাখ্যা রয়েছে তাও গ্রহণযোগ্য হবে এবং সেটাকে কুরআনের সাথে দ্বান্দ্বিক মনে করা যাবে না। সে হিসেবেই ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল ও ইমাম শাফে‘ঈ এ হাদীসের ওপর ‘আমল করেছেন। অথচ কুফাবাসী (হানাফী আলিমগণ) কুরআনের দু’জন সাক্ষী গ্রহণের নির্দেশের সাথে ‘এক সাক্ষী ও দাবীদারের শপথ’ সংক্রান্ত হাদীসকে দ্বান্দ্বিক মনে করে তাতে ‘আমল করেন নি। [সম্পাদক]

[53] ইমাম শাফে‘ঈ রহ. বলেন, কখনও কোনো আয়াত কোনো সহীহ হাদীসের ভাষ্যের সাথে বিরোধপূর্ণ হয় না। যদি বাহ্যিকভাবে এরকম কিছু মনে হয়, তবে সেটাকে কুরআনের ব্যাখ্যা মনে করতে হবে। [সম্পাদক]

যার ফলে মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমাম মনে করেন যে, উক্ত হাদীস দুর্বল, মনসুখ (রহিত) অথবা তাতে তাবিল তথা ব্যাখ্যা করে ভিন্ন মত গ্রহণের অবকাশ রয়েছে)-এর আরও কিছু উদাহরণ হলো:

ক. কুরআনুল কারীমের (عموم) বা অনির্দিষ্ট কে (تخصيص) নির্দিষ্ট করে আসা হাদীসের ওপর আমল না করা।

খ. অথবা কুরআনের আয়াতে আগত (مطلق) শর্তমুক্ত বিধানকে (تقييد) করে আসা হাদীসের ওপর আমল না করা।

গ. অথবা কুরআনের বিধানের চেয়েও হাদীসে কিছু সংযোজন রয়েছে এমন হাদীসের ওপর আমল না করা।

অনুরূপভাবে আরও বিশ্বাস করা যে,

ঘ. কুরআনুল কারীমে বর্ণিত বিধানের ওপর কিছু সংযোজিত বর্ধিত করা হলে (الزيادة على النص), অনুরূপভাবে, কুরআনের শর্তমুক্ত বিধানকে শর্তযুক্ত (تقييد المطلق) করা হলে, তা কুরআনের বিধানকে রহিত করে দেয়। তদ্রূপ অনির্দিষ্ট

বিধানকে নির্দিষ্ট করা (تخصيص العام) দ্বারা সে অনির্দিষ্ট বিধানকে রহিত করা হয়ে যায়[54]।

- অনুরূপভাবে মদীনাবাসীদের কেউ কেউ কখনও কখনও সহীহ হাদীসকে এজন্য ছেড়ে দেয় যে সেটা (عمل أهل المدينة) মদীনাবাসীরা তাতে আমল করতেন না। মদীনাবাসীদের উক্ত হাদীসে আমল না করা ঐ হাদীসের প্রতিকূলে ইজমার মত। আর তাদের (মদীনাবাসীদের) সমষ্টিগত রায় এমন একটি দলীলস্বরূপ, যাকে হাদীসের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ঙ. যেমন, উল্লিখিত কানুনের ওপর ভিত্তি করে (خيار المجلس) তথা ক্রয়-বিক্রয়ের পর স্থান ত্যাগ পর্যন্ত চুক্তি রাখা না রাখার স্বাধীনতা সংক্রান্ত হাদীসের বিরোধিতা করা। তা শুধু এজন্য যে, মদীনাবাসীগণ এ হাদীসের ওপর আমল করেন নি। যদিও অধিকাংশ লোক ভালভাবেই প্রমাণ করবে যে, মদীনাবাসীগণ উক্ত মাসআলায় একমত হন নি। এমনকি যদি মদীনাবাসীগণ একমতও হয়, আর অন্যান্যরা উক্ত মাসআলায় মতানৈক্য

[54] এগুলো উসূলিদের কিছু ধারা। বস্তুত এ সকল ধারাতে যা বর্ণিত হয়েছে, তা সর্বসম্মত ধারা নয়। কারও কারও নিকট সেগুলো 'নাসখ' বা রহিত করার বিধান হলেও অন্যদের নিকট সেটি ব্যাখ্যা পর্যায়ের। সুতরাং যাদের নিকট এ মূলনীতিগুলো দলীল-প্রমাণ, তাদের অনেকের মত হচ্ছে, কুরআন যেহেতু অকাট্য, আর সব হাদীস অকাট্য নয়, সেহেতু অকাট্য বিষয়কে অকাট্য নয় এমন কিছু দ্বারা রহিত করা যাবে না। সে কারণে তারা বেশ কিছু হাদীসের উপর আমল করেন নি। যা মত প্রার্থক্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ বিবেচিত হয়ে আছে। [সম্পাদক]

প্রকাশ করে, তবুও তাদের ইজমার ওপর আমল না করে হাদীসের ওপর আমল বাঞ্ছনীয়।

ঘ. তদ্রূপ মদিনা ও কুফার কতিপয় লোক (قياس الجلي) বা প্রকাশ্য কিয়াসের সাথে দ্বন্দ্বের কারণে কতিপয় হাদীসের ওপর আমল ছেড়ে দেয়। তাদের এ কাজের ভিত্তি হচ্ছে, (القواعد الكلية) বা মৌলিক নীতিসমূহকে ঐ জাতীয় খবর (হাদীস) দ্বারা খণ্ডন করা যায় না।

ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বিরোধী নীতিমালাসমূহ। চাই সে সব দ্বারা বিরোধিতাকারী শুদ্ধভাবেই বিরোধিতাকারী হোন কিংবা ভুলের ওপর থেকেই বিরোধিতাকারী হোন।

এভাবে হাদীসের ওপর আমল না করার মৌলিক দশটি দশটি কারণ সুস্পষ্ট।

হাদীসে আমল না করার অন্যান্য কারণসমূহ

কখনও আলিম ব্যক্তি হাদীসে এমন কারণে আমল ত্যাগ করে, যে সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই

অনেক হাদীস রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে আলিমের কাছে এমন কোনো দলীল-প্রমাণাদি থাকা বৈধ, যার ভিত্তিতে তিনি সেটার ওপর আমল ত্যাগ করবেন, যে দলীলগুলো সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই। কেননা

ইলমের ক্ষেত্র অত্যন্ত প্রশস্ত। আমরা আলিমগণের অন্তর্নিহিত সকল তত্ত্ব জানতে পারি না।

আর আলিম কখনও কখনও হাদীস পরিত্যাগ করার সঙ্গত কারণ প্রকাশ করেন, আবার কখনো কখনো তা প্রকাশ করেন না। প্রকাশ করলেও কোনো কোনো সময় আমাদের কাছে পৌঁছে, আবার কোনো কোনো সময় আমাদের কাছে পৌঁছে না।

অনুরূপভাবে কখনও কখনও সে আলিমের দলীল-প্রমাণ পৌঁছলেও সেটার দলীল নেওয়ার স্থানটি আমরা অনুধাবন করতে পারি, আবার কখনও তাও পারি না; দলীলটি স্বয়ং ঠিক হোক কিংবা না হোক।

আলিমগণের জন্য তাদের মতের সপক্ষে দলীল থাকলেও আমাদের জন্য করণীয়:

কিন্তু আমরা যদিও এটা (কোনো আলিমের কাছে হাদীসের ওপর আমল না করার পক্ষে এমন কোনো যৌক্তিক প্রমাণ থাকা সম্ভব যা আমাদের কাছে পৌঁছে নি, আমরা যদিও এটাকে) জায়েয মনে করি, তবুও আমাদের জন্য, সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, আর যার সপক্ষে আলিম সমাজের একদল মত পোষণ করেছেন এমন কোনো প্রমাণ ত্যাগ করে, এর বিপরীত মত পোষণকারী আলিমের মত গ্রহণ করা জায়েয নয়। এমন সম্ভাবনায় যে হয়ত সে আলিমের কাছে এমন কোনো প্রমাণ রয়েছে যার ভিত্তিতে তিনি হাদীসের সপক্ষের প্রমাণের ওপর আমল করেন নি। যদিও তিনি অন্যান্য আলিমের চেয়েও বড় আলিম হোক না কেন।

কারণ, শরী'আতের দলীল-প্রমাণাদিতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে আলিমগণের মতামতে ভুল হওয়ার অবকাশ বেশি।

কেননা শরী'আতের দলীলসমূহ আল্লাহর সকল বান্দার জন্য আল্লাহর প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠিত। আলিমের মত সেরূপ নয়।

আর শরী'আতের দলীল অন্য দলীলের সাথে সংঘাতপূর্ণ না হলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আলিমের মত সেরূপ নয়।

যদি এই (অর্থাৎ যে মত দলীল-ভিত্তিক ও যার সপক্ষে সহীহ হাদীস রয়েছে এবং যার পক্ষে আলিমগণের একদল মত দিয়েছেন, সে মতের বিপরীতে এমন কোনো আলিমের মত গ্রহণ করা, যার মতটি হাদীসের বিপরীত, যার মতের সপক্ষে কোনো প্রমাণ দেওয়া হয় নি, শুধু এটা বলা হয়েছে যে, হয়ত উক্ত ইমামের কাছে এ ব্যাপারে কোনো দলীল-প্রমাণাদি থেকে থাকবে, যদি এই) নীতির ওপর আমল করা বৈধ হতো, তবে আমাদের সামনে অনুরূপ কোনো দলীলই অবশিষ্ট থাকবে না, যে দলীলের বিপরীতে এ ধরণের কিছু বলা সম্ভব হবে[55]।

---

[55] অর্থাৎ তখন অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, যখনই কোনো সহীহ হাদীসভিত্তিক মতের বিপরীতে দলীল-প্রমাণবিহীন মত সম্পর্কে বলা হবে যে, আপনার মতের সপক্ষে দলীল দিন, তখনই হয়ত বলবে যে, আমার ইমামের কাছে এমন কোনো দলীল আছে যা আমাদের কাছে পৌঁছায় নি। এভাবে বললে তো আর দলীল-প্রমাণাদি পেশ করার আবশ্যকতা থাকে না, আর তখন যে যা ইচ্ছে তা বলতে পারবে। সুতরাং এ ধরণের বিষয় ইমাম ও তার অজ্ঞ অনুসারীদের জন্য ওযর হলেও সব সময়ের জন্য ওযর বিবেচিত হবে না। [সম্পাদক]

কিন্তু উদ্দেশ্য হলো, এটা বলা যে, হয়ত সে মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমামের জন্য হাদীসটির ওপর আমল পরিত্যাগ করার বিষয়টি ওযর হিসেবে গণ্য হবে, আর তাঁর পরিত্যাগের কারণে আমাদের জন্যও সেটার ওপর আমল পরিত্যাগ করা ওযর হিসেবে গণ্য হবে[56]।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ تِلۡكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡۖ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٣٤ ﴾ [البقرة: ١٣٤]

"তারা এক সম্প্রদায় যারা চলে গিয়েছে, তারা যা করেছে তার প্রতিদান তারা পাবে। এবং তোমরা যা করেছ তার প্রতিদান তোমরা পাবে। অতীতে লোকেরা যা করেছে, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৩৪]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

[56] কিন্তু আমল ত্যাগ করার ওযর থাকা ঐ সময় পর্যন্তই গ্রহণযোগ্য, যখন আমাদের কাছে সেই ইমামের দলীল-প্রমাণাদি –তা স্বয়ং শুদ্ধ হোক বা না হোক – সেটা পেশ করা হবে। কিন্তু যখনই বুঝা যাবে যে, সে ইমাম সহীহ হাদীসভিত্তিক প্রমাণের বিপরীতে এমন কোনো দলীল-প্রমাণাদি পেশ করেন নি, তখন শুধুমাত্র, হয়ত তাঁর কাছে এমন কোনো দলীল থেকে থাকবে, যা আমাদের কাছে পৌঁছে নি, এ সম্ভাবনার ভিত্তিতে হাদীসভিত্তিক মতকে পরিত্যাগ করা যাবে না। যদিও ইমামের জন্য সে মতে থাকা জায়েয হবে, আর তার অনুসারীদের জন্যও দলীল স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সেটার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা বৈধ। [সম্পাদক]

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ [النساء: ٥٩]

“অতঃপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদের সম্মুখীন হও, তবে তা ফায়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে সমর্পন কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখ”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯]

কোনো ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে হাদীস পরিত্যাগ করা যায় না

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীসের বিপরীতে কোনো মানুষের কথা বা মতকে দাঁড় করা যাবে না। যেমন, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কোনো মাসআলার প্রশ্নকারীকে হাদীস দ্বারা উত্তর দিয়েছিলেন। প্রতি উত্তরে লোকটি বললেন, আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এরূপ বলেছেন। তখন ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বললেন, সত্বর তোমাদের ওপর আকাশ থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কেননা আমি বলছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর তোমরা বলছো আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন!

উল্লিখিত কারণগুলোর কোনো কারণে হাদীস পরিত্যাগ করা হলে সে মুজতাহিদ ব্যক্তি বা ইমাম সম্পর্কে খারাপ কথা বলা যাবে না

যখন উল্লিখিত কারণগুলোর কোনো কারণে হাদীস পরিত্যাগ করা হয়, (এমতাবস্থায়) যদি হালাল ও হারাম কিংবা অন্য নির্দেশপূর্ণ সহীহ হাদীস

থাকে, তবে এরূপ হাদীসকে বর্ণিত কারণের পরিপ্রেক্ষিতে পরিত্যাগ করলে, তিনি যেহেতু হালালকে হারাম কিংবা হারামকে হালাল অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের পরিপন্থী হুকুম দিয়েছেন। সেহেতু সেই আলিম ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত হবে, এরূপ বলা উচিৎ নয়।

অনুরূপভাবে যদি হাদীসে কোনো কাজের দরুন ভীতিপ্রদর্শন, অভিশাপ, গজব কিংবা এই প্রকারের কোনো শাস্তির কথা থাকে, তবে এই কথা বলা জায়েয নেই যে, আলিম তাকে বা ঐ কাজকে বৈধ করেছেন বলে তিনি এই শাস্তির মধ্যে শামিল।

বাগদাদের কতিপয় মু'তাযিলা, যেমন বিশর আল-মাররীসি[57] ও তার মত কারও কারও বর্ণনা ছাড়া উপরোক্ত রায়ে উম্মতের মধ্যে কারও ভিন্নমত আছে বলে আমাদের জানা নেই[58]। তাদের নিকট, মুজতাহিদ ভুল করলে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত পেতে হবে।

---

[57] তিনি হচ্ছেন, বিশর ইবন গিয়াস ইবন আবী কারীমা আবদুর রহমান আল-মাররীসি, বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্বের সূত্রে তিনি আল-আদ'ওয়ী গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তার কুনিয়াত, আবু আবদির রহমান, মু'তাযিলা ফিরকার ফকীহ, দর্শন সম্পর্কে অভিজ্ঞ, তিনি আর-মাররীসি গোষ্ঠীর প্রধান, যারা 'ইরজা' তথা গুণাহ করলে ক্ষমা পাবে এমন দৃঢ় ধারনায় বিশ্বাসী ছিল। মুরজিয়ারা তার দিকেই সম্পর্কযুক্ত। তিনি জাহম ইবন সাফওয়ানের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তার বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে। ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী তার মতবাদকে খণ্ডন করে 'আন-নাকদ্ব 'আলা বিশর আল-মাররীসি' নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ৩১৮ হিজরী সালে মারা যান।

[58] অর্থাৎ মু'তাযিলা ব্যতীত সকল সহীহ হকপন্থী ইমামের মতই হচ্ছে যে, ইজতেহাদী ভুলের কারণে শাস্তির মুখোমুখি হবে না। [সম্পাদক]

এটা এজন্য যে, হারাম কাজের জন্য শাস্তি প্রযোজ্য হওয়ার শর্ত হলো, হারাম কাজটি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া কিংবা হারাম হওয়া সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে জ্ঞাত হওয়ার শক্তি রাখা।

যে ব্যক্তি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে লালিত পালিত কিংবা নব মুসলিম, সে যদি হারাম হওয়ার অজ্ঞাতসারে কোনো হারাম কাজ করে বসে, তাহলে সে অপরাধী বিবেচিত হবে না বা তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না. যদিও সে বৈধতার জন্য শরিয়তী দলীল তালাশ না করে।

সুতরাং যার কাছে হারাম হওয়ার হাদীস পৌঁছে নি এবং শরিয়তী দলীল দ্বারা মোবাহ্ হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছে, তার ওযর তো সর্বাগ্রে গ্রহণযোগ্য হবে।

আর এ জন্যই তার এ কাজটি যথাসাধ্য (ইজতেহাদ বা) প্রচেষ্টামূলক কার্য বিধায় প্রশংসিত ও প্রতিদানের উপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

ইজতেহাদের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা এবং মুজতাহিদ তার ইজতেহাদের ফলে পুণ্য লাভ

উপরোক্ত কথার সপক্ষে প্রমাণসমূহ নিম্নরূপ:

১- মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ ۝٧٨ فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ﴾ [الانبياء: ٧٨، ٧٩]

“আর দাউদ এবং সুলাইমান এক ব্যক্তির শষ্য বিনষ্ট সম্পর্কে মীমাংসা করছিলেন, তখন ঐ ব্যক্তির শষ্যের মধ্যে ছাগল প্রবেশ করেছিল। আমি ঐ মীমাংসা দেখছিলাম। ঐ মীমাংসা সম্পর্কে আমি সুলায়মানকে সঠিক জ্ঞান দান করেছিলাম। অবশ্য আমি উভয়কেই জ্ঞান ও হিকমত দান করেছিলাম”। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৭৮-৭৯] এখানে আল্লাহ সুলাইমানকে বোধশক্তি দ্বারা বিশেষিত করেছেন এবং তাদের উভয়ের প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন।

২- সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ‘আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন বিচারক সঠিক ইজতিহাদ করে, তখন তার জন্য দু’টি প্রতিদান থাকে। আর ইজতেহাদে ভুল করলে একটি প্রতিদান পাবে।”

এ হাদীসে মুজতাহিদ ভুল করলেও প্রতিদানের কথা পরিস্কার বর্ণনা করা হয়েছে। এটা তার যথাসাধ্য ইজতিহাদ তথা প্রচেষ্টার কারণেই। সুতরাং তার ভুল মার্জনীয়। কেননা প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট হুকুমে নির্ভুল তত্ত্ব পাওয়া অসম্ভব অথবা কঠিন।

৩- মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: ٧٨]

“দীনের মধ্যে তোমাদের জন্য সমস্যাকর কিছুই নেই”। [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৭৮]

৪- অন্যত্র আল্লাহ ঘোষণা করেন:

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“আল্লাহ্ তোমাদের সরল ও সহজ চান, বক্র এবং কঠিন কিছু চান না”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

৫- সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন সাহাবীগণকে বলেন, “বনি কুরাইযার গোত্রে না পৌঁছানো অবধি কেউ আসরের সালাত আদায় করবে না।” কিন্তু পথে যখন আছরের সালাতের সময় হয়ে গেল, তখন কিছু সংখ্যক সাহাবী বললেন, আমরা বনি কোরাইযা ছাড়া সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, তাঁর (রাসূলের) ইচ্ছা এটা নয়, তাই তারা পথেই সালাত আদায় করে নিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু’ দলের কারও ওপরই এর জন্য দোষারোপ করেন নি।’

প্রথম দল, (রাসূলের) বক্তব্যকে সাধারণভাবে গ্রহণ করেছেন। ফলে তারা সালাত ছুটে যাওয়ার অবস্থাকেও সাধারণ হুকুমের অধীন গণ্য করেছেন।

পক্ষান্তরে অন্য সাহাবীগণ এ অবস্থাকে সাধারণ হুকুমের আয়াত্বাধীন মনে না করার সপক্ষে অবশ্যম্ভাবী দলীল পেশ করেছেন। (আর তা হচ্ছে তাদের নিকট) রাসূলের হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে ঘেরাও করেছেন, তাদের কাছে দ্রুত পৌঁছানো।

ফকীহগণের মধ্যে এটা একটি বিরোধপূর্ণ প্রসিদ্ধ মাসআলা যে, কিয়াস দ্বারা অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্ট করা যাবে কিনা? এতদসত্ত্বেও যারা পথে সালাত আদায় করছেন, তারা বেশি সঠিক কাজ করেছেন[59]।

৬- অনুরূপভাবে বেলাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন দুই সা' (صاع) 'খেজুর এক সা[60]-এর পরিবর্তে বিক্রি করলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা ফিরত দেওয়ার আদেশ দিলেন[61]। (সহীহ বুখারী ও

---

[59] অথচ তারা কিয়াসকে 'নস' এর বিপরীতে ব্যবহার করেছেন। তারপরও তারা যদি সঠিক পদ্ধতিতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, এটা হচ্ছে দীনের ফিকহের কারণে। যারা ফকীহ তারা সত্যিকার অর্থে হুকুম বা বিধানের প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করে সেটার উপর আমল করতে চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে শুধু 'নস' এর প্রকাশ্য রূপের উপরও অনেকে আমল করে থাকেন। তাদের এ পদ্ধতিও সঠিক। তবে প্রথম গোষ্ঠীর মূল্যায়ণ হচ্ছে, আহলুল ফিকহ হিসেবে, তারা যুগ যুগ ধরে সম্মানিত। আর দ্বিতীয় গোষ্ঠীর মূল্যায়ণ হচ্ছে যে, তারা রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী, আহলে হাদীস হিসেবে। তারাও কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানের অধিকারী। যদি উভয় পদ্ধতিকে একসাথ করে সমন্বয় করা যায়, তবে তা হবে নূরুন 'আলা নূর। তাদের মধ্যে পরস্পর মতান্তর থাকতে পারে তবে মনন্তর নয়। প্রত্যেকেই ইনশাআল্লাহ সঠিক পথের পথিক। [সম্পাদক]

[60] এক সা' এর পরিমাণ হচ্ছে, সাধারণত: পূর্ণ বয়স্ক লোকের দু' হাতের মধ্যস্থিত বস্তু চার বার নিলে যা হয়, তা। তবে সেটার ওজনের দিকে হিসেব করলে, হানাফীদের নিকট ৩২৬১.৫ গ্রাম, আর অন্যান্য ইমামদের নিকট ২১৭২ গ্রাম। সাধারণত চার মুদ মিলে এক সা' হয়। আর এক মুদ সমান, হানাফীদের নিকট ৮১৫.৩৯ গ্রাম; যা দুই রতল। অন্যান্যদের নিকট ৫৪৩ গ্রাম, যা এক রতল ও অন্য রতলের ৩/২ অংশ। [সম্পাদক]

[61] আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, বিলাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বুরনী খেজুর নিয়ে আসলে, রাসূলুল্লাহ্

মুসলিম) কিন্তু এজন্য বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সুদ খাওয়ার হুকুম হিসেবে ফাসিক, লা'নত কিংবা কঠোরতার সম্মুখীন হন নি। কেননা এটা হারাম হওয়া সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না।

৭- তদ্রূপ আদি ইবন হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সাহাবীগণের এক দল কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]

"যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো দাগ হতে সাদা দাগ পরিদৃষ্ট হয়।" এর অর্থ সাদা ও কালো রশি মনে করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বালিশের নিচে সাদা কালো দুইটি সুতা রাখতেন। দুইটি সুতার মধ্যে একটি অপরটি হতে স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত তারা সাহরী খেতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আদি ইবন হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন:

«إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ»

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোত্থেকে? বিলাল বললেন, আমাদের কাছে কিছু খারাপ খেজুর ছিল, তা থেকে দু' সা' বিনিময়ে এক সা' নিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "উওয়াহ, এটাই তো সুদ, এটা করবে না, বরং তুমি যখন বিক্রয় করতে চাইবে, তখন অন্য কিছু দিয়ে খেজুর বিক্রয় করে ফেলবে, তারপর সেটা দিয়ে খেজুর কিনে নিবে"।

“যদি সাদা ও কালোর অর্থ সুতা হয়ে থাকে, তা হলে তোমার বালিশ বেশ প্রশস্ত! তার অর্থ এই নয়, বরং তার অর্থ রাতের অন্ধকার এবং দিনের আলো)”। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)[62]।

এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথার ইঙ্গিত দিলেন যে, তারা আয়াতের ভাবার্থ বুঝতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দ্বিতীয়বার সিয়াম পালন করার নির্দেশ দেন নি এবং রমযানের দিবসে তাকে সিয়াম পরিত্যাগ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন নি, যদিও সিয়াম ত্যাগ করা মারাত্মক কবীরা গুণাহ।

ইজতিহাদের কারণে তিরষ্কারের ব্যতিক্রম ঘটনা

উল্লিখিত মাসআলার বিপরীত হলো আহত ব্যক্তির শীতের মধ্যে গোসলের ফাতওয়া: (জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, প্রচণ্ড শীতের সফরে কোনো একজন সাহাবী মারাত্মক আহত হলেন, তারপর তার স্বপ্নদোষ হলে তিনি উপস্থিত সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমি কি গোসল করবো, না তায়াম্মুম করবো ?) সাহাবীরা প্রচণ্ড শীতে তাকে গোসলের ফাতওয়া দিলেন। গোসলের দরুন ঐ

---

[62] এখানে একটি কথা জানা আবশ্যক যে, ‘আদী ইবন হাতেম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর এ ঘটনাটি আয়াতটি নাযিল হওয়ার অনেক পরের ঘটনা। কারণ, আয়াতটি দ্বিতীয় হিজরীতে নাযিল হয়, পক্ষান্তরে আদী ইবন হাতেম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন ১০ম হিজরী সালে। সহীহ মুসলিমের হাদীস নং ১০৯০ পড়লে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তিনি নিজে ইজতিহাদ করেছেন এবং ভুল করেছিলেন। [সম্পাদক]

সাহাবীর মৃত্যু হয়। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছালে তিনি বললেন, "তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুন। যদি তারা না জানে তো জিজ্ঞেস করল না কেন? অজ্ঞতার ঔষধ তো কেবল জিজ্ঞেস করা"। (আবু দাউদ)

এর কারণ হচ্ছে, ঐ সকল লোক ইজতিহাদ ব্যতিরেকেই ভুল করেছিলেন। কেননা তারা বিদ্বান (أهل العلم) ছিলেন না[63]।

৮- অনুরূপভাবে উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হুরাকাত যুদ্ধে যখন কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠকারীকে হত্যা করেন[64], তখন তার ওপর

---

[63] এটাই প্রমাণ করে যে, ইজতেহাদ করার জন্য আলেম হওয়া লাগবে। সাধারণ শিক্ষিত মানুষের কোনো ইজতিহাদ সওয়াবের জন্য গ্রহণযোগ্য ওযর নয়। অবশ্যই তাদেরকে দীনী জ্ঞানে জ্ঞানী হতে হবে। [সম্পাদক]

[64] ইমাম বুখারী সাহাবী উসামা ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহাইনা গোত্রের হুরাকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠালেন। সকালবেলা যুদ্ধ করে আমরা তাদের পরাজিত করলাম। তিনি বলেন, তখন আমি ও আমার এক আনসারী লোক তাদের এক লোককে বাগে পেলাম। যখন আমরা তাকে বেষ্টন করে ফেললাম, তখন সে বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বলেন, তখন আনসারী তাকে হত্যা করা হতে বিরত হলো। কিন্তু আমি তাকে আমার অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে হত্যা করলাম। তিনি বলেন, অতঃপর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম, তখন তাঁর কাছে সেটার খবর পৌঁছল। তিনি তখন আমাকে বললেন, উসামা, তুমি কি তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করলে?! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, সে তো তা বাঁচার জন্য বলেছে। তিনি আবার বললেন, তুমি কি তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করলে?! এভাবে বারবার বলতে

দিয়াত বা কাফ্ফারা কিছুই ওয়াজিব করেন নি। কেননা উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ধারণা ছিল যে, এরূপ সংকটময় মুহুর্তের (Critical Moment) ইসলাম গ্রহণ গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং তাকে হত্যা করা জায়েয, যদিও মুসলিমকে কতল করা হারাম কাজ।

সালাফে সালেহীন (Anciant Puritous) ও অধিকাংশ ফকীহ্গণ এ মতটি গ্রহণ করে বলেছেন, গ্রহণযোগ্য তাবিল বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিদ্রোহীগণ ন্যায়পরায়নগণকে হত্যা করলে সেটার জন্য কিসাস, কাফ্ফারা বা দিয়াত দিতে হবে না। যদিও মুসলিমকে হত্যা করা ও তাদের সাথে যুদ্ধ করা হারাম।

আর শাস্তি প্রযোজ্য হবার যে শর্তটি আমরা উপরে বর্ণনা করেছি[65], প্রত্যেক নির্দেশনায় এর উল্লেখ জরুরী নয়। কেননা এই সম্পর্কীয় জ্ঞান হৃদয়ে বিরাজমান। যেমন, আমলের প্রতিদানের ওয়াদার জন্য শর্ত হলো খালেছভাবে আল্লাহর জন্য আমল করা এবং মুরতাদ (Apostate)

থাকলেন, এমনকি আমি মনে করতে লাগলাম, হায় আমি যদি এদিনের আগে ইসলাম গ্রহণ না করতাম!

হুরাকা হচ্ছে, জুহাইনা গোত্রের একটি শাখা, বনী মুররার বাসভূম বাতনে নাখলার পিছনে তাদের আবাসভূমি ছিল। সে যুদ্ধটি ৭ম অথবা ৮ম হিজরী সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে যুদ্ধের আমীর ছিলেন গালেব ইবন উবাইদুল্লাহ আল-কালবী, আর যাকে উসামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হত্যা করেছিলেন তার নাম ছিল, মিরদাস ইবন নাহীক।

[65] আর সেটা হচ্ছে, হারাম কাজটি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া কিংবা হারাম হওয়া সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে জ্ঞাত হওয়ার শক্তি রাখা। [সম্পাদক]

হওয়ার কারণে আমল বরবাদ না হওয়া। এই শর্তটি প্রত্যেক নেক কাজের প্রতিদানের ওয়াদাপূর্ণ হাদীসেই উল্লেখ করা হয় না।

তারপরও (আরও একটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য, তা হচ্ছে) কোথাও যদি শাস্তি প্রয়োগ অনিবার্য হয়েও পড়ে, তখনও ঐ শাস্তির হুকুম প্রতিবন্ধকতার কারণে রহিত হয়ে থাকে।

আর শাস্তি অনিবার্য হলেও যে সকল প্রতিবন্ধকতার বিবিধ কারণে তা প্রয়োগ করা যায় না। যেমন,

ক. তাওবা করে।

খ. আল্লাহর দরবারে গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার প্রার্থনা করে।

গ. এমন সৎকাজ করে যা দ্বারা গুনাহ মুছে যায়।

ঘ. দুনিয়ার বালা মুসীবত।

ঙ. গৃহীত সুপারিশকারীর সুপারিশ বা শাফা'আত।

চ. পরম করুণাময় আল্লাহর রহমত।

যখন উল্লিখিত সমস্ত উপকরণগুলোর অনুপস্থিতি ঘটে, তখন আযাব বা শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অবশ্য উল্লিখিত উপকরণগুলোর অনুপস্থিতি শুধু ঐ সমস্ত লোকের পক্ষে হয়ে থাকে, যারা সীমালঙ্ঘনকারী, নাফরমান অথবা মালিকের হাত থেকে পলায়ণরত জন্তুর ন্যায় পালিয়ে যেতে উদ্যত।

কারণ, প্রকৃত শাস্তির ধমক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটা বর্ণনা করা যে, নিশ্চয় এ কাজটি হচ্ছে ঐ শাস্তির কারণ। আর যখন এ রকম কিছু আসবে, তখন বুঝা যাবে যে, ঐ কাজটি হারাম এবং গর্হিত।

অতএব, কোনো লোকের কাছে (শাস্তি হওয়ার) কারণ পাওয়া গেলেই যে সে ব্যক্তি অবশ্যই যেটার কারণ হয়েছে সেটার (শাস্তির) সম্মুখীন হবে, সেটা একেবারেই বাতিল বা অসার কথা। কেননা কারণকৃত বস্তুর (শাস্তির) প্রাপকের জন্য সেটার শর্ত যেমন পাওয়া অপরিহার্য, তেমনি সকল প্রকারের প্রতিবন্ধকতা না থাকাও আবশ্যক।

কোনো ব্যক্তি হাদীসে আমল না করলে তা তিন প্রকারের বহির্ভূত নয়

আর এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো হাদীসের ওপর আমল ছেড়ে দেয়, তখন সে নিম্নোক্ত তিন প্রকার থেকে মুক্ত নয়:

প্রথম প্রকার

হয়তবা এই পরিত্যাগ মুসলিমগণের সম্মিলিত মত অনুযায়ী জায়েয। যেমন, যার কাছে হাদীস পৌঁছে নি এবং ফাতওয়া বা হুকুমের প্রতি প্রয়োজনীয়তা সত্বেও হাদীস সন্ধানে ত্রুটি করেনি, তার জন্য হাদীস ত্যাগ করা। যেমন, আমরা খুলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তাদের কাছেও বহু হাদীস পৌঁছে নি। এ অবস্থায় হাদীস পরিত্যাগকারী গুনাহগার হবে না। এ বিষয়ে কোনো মুসলিম সন্দেহ করতে পারে না।

দ্বিয়ীয় প্রকার

যে অবস্থাতে হাদীসটি পরিত্যাগ করা জায়েয নেই। এরূপ পরিত্যাগ ইমামগণের পক্ষ হতে কখনও হতে পারে না ইনশা-আল্লাহ্।

তৃতীয় প্রকার

তবে কোনো কোনো আলিম থেকে এটা আশংকা করা হয়ে থাকে যে, কোনো আলিম উক্ত মাসআলার হুকুম বুঝতে অক্ষম। এমতাবস্থায় রায় প্রদানের কারণ না থাকা সত্ত্বেও রায় প্রদান করে। যদিও উক্ত মাসআলায় তার চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা ছিল অথবা দলীল গ্রহণ কিংবা প্রদানে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও চিন্তার শেষ প্রান্তে পৌঁছার পূর্বেই রায় প্রদান করে বসে, যদিও সে দলীল আঁকড়ে থাকে কিংবা কোনো অভ্যাস তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফলে সে অভ্যাসবশতঃ ফাতওয়া দিয়ে বসে অথবা কোনো উদ্দেশ্য তার ওপর জয়লাভ করে, যার ফলে সে তার কাছে যে দলীল রয়েছে সেটার বিপরীত যা আছে তাতে পূর্ণ চিন্তা ভাবনা কাজে লাগাতে অপারগ হয়ে পড়ে। যদিও সে যা বলে তা ইজতিহাদ ও দলীল গ্রহণের মাধ্যমেই বলে থাকে। কারণ, ইজতেহাদের যে চূড়ান্ত সীমা রয়েছে, মুজতাহিদ কখনও কখনও সেটা ভালো করে আয়ত্ব করতে অক্ষম থেকে যায়।

ফতোয়া প্রদানে সালাফে সালেহীনের সাবধানতার অন্যতম কারণ

আর এ কারণেই সালাফে সালেহীন এ ধরণের ফাতওয়া প্রদান করতে ভয় করতেন। এ আশংকায় যে, বিশেষ মাসআলার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদ নাও সংঘটিত হতে পারে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো নিঃসন্দেহে গুনাহের কাজ, কিন্তু গুনাহের শাস্তি কাউকে তো তখনই দেওয়া হয়, যখন সে তাওবা করে না। আবার কখনও কখনও ইসতেগফার, ইহসান, বালা-মুসীবাত, শাফা‘আত ও রহমতের দ্বারা গুনাহ মুছে যায়।

তন্মধ্যে যারা এর মধ্যে শামিল হবে না, বিশেষ করে যার ওপর প্রবৃত্তি তার বিবেকের ওপর জয়ী হয়েছে এবং যাকে প্রবৃত্তি ধরাশায়ী করে ফেলেছে, এমনকি সে কোনো কিছুকে বাতিল জানার পরও অথবা কোনো মাসআলার হাঁ বা না বোধক দলীল সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত না হয়েও কোনো একটি মতকে সঠিক অথবা ভুল বলার ক্ষেত্রে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে, তারা উভয়েই জাহান্নামের অধিবাসী। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“তিন ধরণের বিচারক (Judge) আছে। দুই প্রকারের বিচারক জাহান্নামে এবং এক প্রকারের বিচারক জান্নাতে যাবেন। যিনি জেনে শুনে বিচার করেন, তিনি জান্নাতে যাবেন। আর দুই প্রকার বিচারক যারা জাহান্নামে যাবে: তাদের মধ্যে একজন হলো, যে না জেনে বিচার করে, অন্যজন হক ও ন্যায় জানা সত্ত্বেও তদনুযায়ী বিচার করে না”। (আবু দাউদ, ইবন মাজা)[66]।

---

[66] হাদীসের শব্দ হচ্ছে নিম্নরূপ:

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

কাজীদের (বিচারক) ন্যায় মুফতীগণেরও একই অবস্থা হয়ে থাকে: তবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য শাস্তির প্রযোজ্য না হওয়ার ক্ষেত্রে কতিপয় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, উম্মতের কাছে প্রশংসিত ও প্রসিদ্ধ কোনো আলিমের কাছ থেকে এরূপ (নিষিদ্ধ ও জাহান্নামে যাওয়ার ধমক দেওয়া হয়েছে যে দু' কারণে সে) অবস্থার সৃষ্টি হয়, যদিও এটা অসম্ভব বা অবান্তর, তবে মনে করতে হবে উল্লিখিত (হাদীসের ওপর আমল না করার) কারণগুলোর কোনো একটি তাদের মধ্যে অবশ্যই ছিল। যদি এরূপ কিছু ঘটেও থাকে তবুও সাধারণভাবে তাদের ইমাম হওয়ার মধ্যে কিছুতেই দোষ দেওয়া যায় না।

ইমামগণের পদ মর্যাদা

ইমামগণের নির্ভুলতায় আমরা বিশ্বাস করি না, বরং তাদের ভুল কিংবা গুনাহে পতিত হওয়া সম্ভব বলে আমরা মনে করি। তা সত্ত্বেও আমরা তাদের জন্য উচ্চাসনের আশা পোষণ করি। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নেক আমল ও উন্নত অবস্থা দ্বারা বিশেষায়িত করেছেন। অধিকন্তু তারা বার বার গুনাহে পতিত হন না। তবে তারা সাহাবীয়ে কিরামের অপেক্ষা উচ্চাসনে সমাসীন নন।

মুজতাহিদ ইমামগণের ব্যাপারে যা বলা হলো সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য, সে সব ব্যাপারে যাতে তারা ইজতিহাদ করে ফাতওয়া দিয়েছেন, বিভিন্ন ব্যাপার স্যাপার ঘটেছে এবং তাদের

মধ্যে যে সকল রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, ইত্যাদি। 'আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকুন'।

ইমামগণ ইজতিহাদের কারণে কোনো হাদীসের ওপর আমল না করলেও আমাদের করণীয়

তারপর (কথা হচ্ছে) হাদীসের ওপর আমল পরিত্যাগকারী ওপরে বর্ণিত ইমাম বা মুজতাহিদ ব্যক্তির ওযর-আপত্তি গৃহীত, বরং সে প্রতিদান প্রাপক হলেও, এটা আমাদেরকে সহীহ হাদীসের অনুরসণ করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। বিশেষ করে যখন আমরা এমন সহীহ হাদীস পাব যার ওপর আমল করার ক্ষেত্রে বিরোধী কোনো কিছুই বাধা দেয় নি। আর এটা বিশ্বাস করতেও বাধা দিতে পারে না যে, উম্মতের সবার জন্য এ সব সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা এবং তা প্রচার করাও ওয়াজিব। আর এটি এমন বিষয় যাতে আলিমগণের কোনো মতানৈক্য নেই।

হাদীসের জ্ঞান ও আমলের ক্ষেত্রে হাদীসের প্রকারভেদ

তারপর (এটা জানাও আবশ্যক যে,) এ সব হাদীস দু'ভাগে বিভক্ত।

১. প্রথম প্রকার হাদীস, যার দ্বারা অর্জিত জ্ঞান (অকাট্য হওয়া) ও যার ওপর আমল করার ক্ষেত্রে আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। যেমন, সনদ ও মতনের দিক থেকে অকাট্য প্রমাণিত হওয়া। আর সেটি হচ্ছে ঐ সব হাদীস, যা সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেছেন এবং আরও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে হাদীসের দ্বারা তিনি এ অবস্থাটিরই ইচ্ছা করেছেন।

২. অন্যপ্রকার হাদীস, যার দ্বারা উদ্দেশ্য 'যাহের'[67] বা অকাট্য নয়।

তন্মধ্যে **প্রথম প্রকারের হাদীসের চাহিদা** তথা চাওয়া-পাওয়া মোতাবেক ইলম অর্জন করা (অকাট্য হিসেবে গ্রহণ করা) ও তার ওপর আমল করা ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করতে হবে। মোটামুটিভাবে এতে আলিমদের মধ্যে দ্বিমত নেই।

অবশ্য কোনো কোনো হাদীসের সনদের ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে যে, হাদীসটির সনদ কি অকাট্য, নাকি অকাট্য নয়? অথবা হাদীসটির দালালাত বা চাহিদা কি অকাট্য, নাকি অকাট্য নয়?

যেমন, সে সব খবরে ওয়াহেদের বিষয়টি, যেগুলো উম্মাতের লোকেরা গ্রহণযোগ্য ও সত্য বলে মেনে নিয়েছে অথবা সেসব খবরে ওয়াহেদ, যেগুলোর ওপর আমলের ব্যাপারে উম্মতের সবাই একমত হয়েছে। এসব খবরে ওয়াহেদের ব্যাপারে সকল ফকীহ ও অধিকাংশ মুতাকাল্লিম[68] একমত যে, এগুলো দ্বারা ইলমে ইয়াকীন বা অকাট্য জ্ঞান

---

[67] আমরা আগেই বলেছি যে, যাহের ঐ পরিভাষা, যাতে শব্দের অর্থ স্পষ্ট, কিন্তু তাতে অন্য অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। [সম্পাদক]

[68] মুতাকাল্লিম বলতে অভিধানিকভাবে বুঝায়, যে কথা বলে। কিন্তু পারিভাষিকভাবে তাদেরকে বুঝায়, যারা কুরআনকে আল্লাহর কালাম বা কথা হওয়া, সে কথা শব্দের

অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কোনো কোনো মুতাকাল্লিম মনে করেন যে, এর দ্বারা ইলমে ইয়াকীন বা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না।

অনুরূপভাবে, যে সব খবর বিশেষ বিশেষ লোক কর্তৃক বিভিন্ন পন্থায় বর্ণিত হয়েছে এবং একটি অপরটিকে সত্যায়িত করে, এমতাবস্থায় এই খবরে ওয়াহেদ ঐ ব্যক্তির জন্য দৃঢ় ইলম (علم يقين) এর ফায়দা দিবে, যিনি বর্ণিত পন্থা, খবর দাতাগণের অবস্থা এবং খবরের পূর্বাপর ও পরিশিষ্ট সম্পর্কে জ্ঞাত। আর যারা উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত নয়, তাদের জন্য এই খবর দ্বারা ইল্‌মের ফায়দা হয় না।

এ কারণেই হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন লোকগণ, যারা শুধু হাদীসের জন্যই নিজেদের জীবনকে নিয়োজিত করেছেন, তারা কিছু 'খবরে ওয়াহেদ' দ্বারা পূর্ণ ইলমে ইয়াকীন লাভ করে থাকেন, যদিও অন্যান্য আলিমগণের নিকট সেগুলো দ্বারা 'সত্য জ্ঞান' (العلم بالصدق) তো দূরের থাক, 'সত্য ধারণা' (الظن بالصدق)ও অর্জিত হয় না।

মাধ্যমে হওয়া না হওয়া, সে কথা প্রাচীন হওয়া ইত্যাদি নিয়ে খুব বেশি কথা বলেছে। সংক্ষেপে এ গোষ্ঠী দ্বারা জাহমিয়্যা, শিয়া, মু'তাযিলা, আশা'য়েরা এবং মাতুরিদীদেরকে বুঝায়। তারা আল্লাহর কালাম নিয়ে অযথা সময়ক্ষেপন করেছে, তর্কযুক্ত চালিয়েছে। অথচ কুরআন আল্লাহর কালাম বা কথা। যা আল্লাহর গুণ। তিনি শব্দ ও অর্থ দু'টির সমন্বয়েই বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা অনাদি কাল থেকেই কথা বলছেন এবং যখন যা ইচ্ছে কথা বলেন। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফে'ঈ ও আহমদ ইবন হাম্বলের মত। [সম্পাদক]

খবর বা সংবাদ[69] কখন ইলমের ফায়দা দেয়

আর এর ভিত্তি হচ্ছে, কোনো খবর বা তথা সংবাদ 'ইলম' বা 'নিশ্চিত সত্য' হওয়ার বিষয়টি নিম্নোক্ত কয়েকভাবে অর্জিত হয়ে থাকে:

১. কখনও খবরদাতার আধিক্য।

২. কখনও খবরদাতাগণ বিশেষ বিশষ গুণে গুণান্বিত হওয়া।

৩. কখনও খবরটি এরূপভাবে বর্ণনা করা হয় যাতে শ্রোতাদের বিশ্বাস জন্মে।

৪. আবার কখনও খবরপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বয়ং সেটার সত্যতা প্রাপ্তি।

৫. আবার কখনও যে খবরটি দেওয়া হচ্ছে, সেটাতে এমন কিছু থাকা যা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

আবার অল্প সংখ্যক এমন লোকের খবর দ্বারাও (علم) 'দৃঢ় জ্ঞান' অর্জিত হয়, যখন তাদের দীনদারী ও সংরক্ষণশীলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তাদের পক্ষ হতে মিথ্যা কিংবা ভুল হওয়ার অবকাশ থাকে না। পক্ষান্তরে তারা ব্যতীত অন্যান্যরা যদি সংখ্যায় তাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশিও হয়, তবুও তাদের খবর দ্বারা কখনও কখনও (علم) 'দৃঢ় জ্ঞান' অর্জিত হয় না।

[69] আর হাদীসও তো খবর বা সংবাদই বটে। সুতরাং খবরের ব্যাপারে যা প্রযোজ্য হবে, হাদীসের ব্যাপারেও তা-ই প্রযোজ্য হবে। [সম্পাদক]

এটিই হচ্ছে একটি বাস্তব সত্য কথা, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। অধিকাংশ ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং একদল মুতাকাল্লিমও এ মতই পোষণ করেন।

যদিও অপর এক দল মুতাকাল্লিম (কালামশাস্ত্রবিদ) ও ফকীহের অভিমত এই যে, কোনো বিশেষ সংখ্যক লোকদের দেওয়া খবরে কোনো ব্যাপারে ইলমূল ইয়াকীন বা দৃঢ় ইলম প্রমাণিত হলে অন্যান্য ঘটনাসমূহেও অনুরূপ বিশেষ সংখ্যকের দেওয়া খবর দৃঢ় ইল্‌মের ফায়দা দিবে। যা একান্তই বাতিল ও অমূলক কথা। অবশ্য এর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার স্থান এটি নয়।

অবশ্য যে সকল বহিরাগত আনুষাঙ্গিক প্রমাণাদি খবরপ্রাপ্তদের কাছে কোনো খবর দ্বারা ইলম তথা 'দৃঢ় জ্ঞান' অর্জনের ব্যাপারে প্রভাব ফেলে থাকে, সেটার বর্ণনা আমরা এখানে করলাম না। কারণ, এই জাতীয় আনুষাঙ্গিক প্রমাণাদিই 'ইলম' তথা 'দৃঢ় জ্ঞান' প্রদান করে থাকে, যদিও সেটার সাথে খবর সংশ্লিষ্টতা না থাকে[70]।

আর যদি সে বহিরাগত আনুষাঙ্গিক প্রমাণটিই ইলম তথা দৃঢ়জ্ঞান প্রদান করে, তাহলে সেটা মোটেই খবরের অনুগামী বিষয় নয়। যেমনিভাবে

---

[70] যেমন কারও মাথায় পাগড়ি পরার অভ্যাস আছে। অপর ব্যক্তির পাগড়ি পরার বিষয়টি জানা নেই। এমতাবস্থায় দেখা গেলো যে, পাগড়ি মাথায় দেয় এমন লোকটি খালি মাথায় যে পাগড়ি পরে না তার পিছনে দৌড়াচ্ছে আর বলছে, আমার পাগড়ি, আমার পাগড়ি। এটা এমন এক আনুষাঙ্গিক প্রমাণ, যারা দ্বারা বুঝা যায় যে, লোকটি তার পাগড়ি নিয়ে পালাচ্ছে। [সম্পাদক]

খবরও সেই ‘বহিরাগত প্রমাণাদি’র অনুগামী নয়। বরং খবর ও আনুষাঙ্গিক প্রমাণ উভয়টিই কখনও কখনও ‘ইলম’ তথা দৃঢ়জ্ঞান প্রদান করে, আবার কখনও দৃঢ় ধারণার জন্ম দেয়। আবার কখনও ঐ দু’টি মিলে ইলমূল ইয়াকীন বা দৃঢ় ইল্‌মের ফায়েদা প্রদান করে, আবার কখনও এ দু’টির একটি ইলম তথা দৃঢ়জ্ঞান লাভ বাধ্য করে, আবার কখনও একটি দ্বারা অকাট্য ইলম, অন্যটি দ্বারা দৃঢ় ধারণা অর্জিত হয়।

আর যখনই কেউ খবর সম্পর্কে বেশি জ্ঞানী হয়, তখনই সে এমন খবরের সত্যতার ব্যাপারে অকাট্য বিশ্বাস করে, যা অন্যের কাছে তেমন অকাট্য নয়, কারণ সে খবর সম্পর্কে পূর্বোক্ত ব্যক্তির মত জ্ঞানী নয়।

হাদীসের ওপর আমল না করার আরও একটি কারণ

কখনও কখনও আলিমগণের মধ্যে এজন্য মতবিরোধ দেখা যায় যে, এ হাদীসটির দালালাত বা চাহিদা কাত‘ঈ তথা অকাট্য ও অনিবার্য হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে কিনা? কারণ হাদীসটি কি ‘নস’[71], নাকি ‘যাহের’[72]?

আর যদি সেটি ‘যাহের’ হয়, তখন সেখানে কি এমন কিছু পাওয়া যায় যা অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত অর্থ নেওয়া থেকে বিরত রাখবে? না কি এমন কিছু নেই? বস্তুতঃ এটি একটি বিশাল অধ্যায়।

---

[71] হাদিসটি কী এ অর্থে ব্যবহারের জন্যই আনা হয়েছে? ফলে সেটি ‘নস’ হিসে বিবেচিত হবে, নাকি সেটি এ অর্থও হতে পারে, আবার ব্যাখ্যা করে সেটির অন্য অর্থও করা যায়? ফলে সেটি ‘যাহের’ হিসেবে বিবেচিত হবে? [সম্পাদক]

[72] অর্থাৎ যার অর্থ প্রকাশ্য, কিন্তু তাতে ব্যাখ্যা করে অন্য অর্থ নেওয়ার সম্ভাবনা আছে। [সম্পাদক]

একদল আলিম কোনো কোনো হাদীসের অর্থ ও চাহিদাকে কাত‘ঈ বা অকাট্য হিসেবে গ্রহণ করে, অথচ অন্যরা সে অর্থ ও চাহিদাকে অকাট্য হিসেবে নেয় না। যারা সে অর্থ বা চাহিদাকে অকাট্য হিসেবে গ্রহণ করেন, তাদের মতে এ হাদীসটি শুধু এই নির্দিষ্ট অর্থই বহন করে, অন্য অর্থের অবকাশ রাখে না। অথবা তারা জানে যে, এ হাদীসটিকে অন্য অর্থে নেওয়ার ব্যাপারে বাধা রয়েছে। অথবা অন্য কোনো কারণ থাকবে যা তাদেরকে বাধ্য করছে এটা বলতে যে, এ হাদীসটির একটি অর্থ গ্রহণই অকাট্যভাবে নির্ধারিত[73]।

আর দ্বিতীয় প্রকার হাদীস অর্থাৎ যেখানে হাদীসটির ‘দালালাত’ বা চাহিদা (অকাট্য না হয়ে) ‘যাহের[74]’ হবে। শরী‘আতী আহকাম তথা বিধি-বিধানে এ প্রকার হাদীসের ওপর আমল করা গ্রহণযোগ্য সকল আলিমের মতে ওয়াজিব[75]।

[73] সুতরাং তারা যে অর্থ গ্রহণ করেছে, সে অর্থ অকাট্য হিসেবেই নিয়েছে এবং হাদীসের উপর আমল করেছে। অথচ অন্য আলেমগণের নিকট এ সকল কারণ স্পষ্ট না হওয়ার তারা সে হাদীসের অর্থ সম্পর্কে অকাট্য কোনো সিদ্ধান্ত দেয় নি। ফলে তারা সেটার উপর আমল করে নি। বা আমল করার ব্যাপারে ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে বলে মনে করে নিয়েছে। [সম্পাদক]

[74] যাহের এর সংজ্ঞায় আমরা আগেই বলেছি যে, তা দ্বারা শুধু একটি অর্থের সম্ভাবনা থাকে না, বরং সেটিতে ব্যাখ্যা করে অন্য অর্থ নেওয়ার অবকাশ রয়েছে। [সম্পাদক]

[75] লক্ষ্য করুন, পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার হাদীস ছিল, ‘নস’। **যাতে অকাট্য ইলম হিসেবে গ্রহণ ও তার চাহিদা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। আর বর্তমান দ্বিতীয় প্রকার হাদীস হচ্ছে**, ‘যাহের’। যাতে অকাট্য ইলম অর্জনের কথা নেই, তবে তার চাহিদা অনুসারে আমল করা

খবরে ওয়াহেদ দ্বারা ধমকি কার্যকর করার ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ

অতঃপর যদি এই হাদীসটি ইলম তথা আকীদা বিষয়ক কোনো বিধান সম্বলিত হয়, যেমন শাস্তির ধমক সংক্রান্ত ও অনুরূপ বিষয়াদি হয়, তবে তাতে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

প্রথম মত

এমতাবস্থায় কতিপয় ফকীহের মত হলো, খবরে ওয়াহেদ এর বর্ণনাকারী যখন ন্যায়বান ও নির্ভরযোগ্য হবে এবং তাতে কোনো কাজের শাস্তির ধমক সম্বলিত হবে, তখন ঐ হাদীসের চাহিদা অনুসারে আমল করা ওয়াজিব। অর্থাৎ কাজটি হারাম জ্ঞান করতে হবে। তবে এর দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সেটা দ্বারা যে শাস্তির ধমকি এসেছে তা কার্যকর করা যাবে না, যতক্ষণ না হাদীসটি কাত‘ঈ বা অকাট্য বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে সেখানেও একই বিধান বর্তাবে, যেখানে হাদীসের ‘মতন’ বা মূল শব্দ অকাট্য হয়, কিন্তু তার চাহিদা ‘যাহের’ হয়[76]।

ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি যে গ্রহণযোগ্য আলেমদের মত সেটা বর্ণিত হয়েছে। [সম্পাদক]

[76] অর্থাৎ সেখানেও আমল করা ওয়াজিব, কিন্তু হাদীস লব্ধ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে বিধান প্রয়োগ করা যাবে না।

এর ওপরই আবু ইসহাক আস সুবাই‘ঈর স্ত্রীর কাছে ‘আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথাকে গণ্য করা হয়েছে। যেখানে তিনি বলেছিলেন,

«أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ»

“যায়েদ ইবন আরকামকে জানিয়ে দাও যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার জিহাদের সাওয়াব বাতিল করা হয়েছে, যদি না সে তাওবা করে।” (দারাকুতনী)[77]।[78]

আলিমগণ বলেন, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যায়েদ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিহাদ বাতিল হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। কেননা তিনি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সুতরাং সেই জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় হারাম হওয়া সম্পর্কে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে আমল করা হবে।’ যদিও আমরা ঐ শাস্তির কথা বলি না যে, যায়েদ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিহাদ বাতিল হয়ে গেছে। কেননা সেই হাদীসটি খবরে ওয়াহেদ-এর সমপর্যায়।

---

[77] দারাকুতনী, আস-সুনান, হাদীস নং ৩০০২।

[78] বিস্তারিত ঘটনা এই যে, আবু ইসহাকের স্ত্রী যায়েদ ইবন আরকাম আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বাকীতে আটশত দিরহামের বিনিময়ে একটি গোলাম বিক্রয় করে। তৎপর যায়েদ ইবন আরকাম ঐ গোলামটি বিক্রয় করতে চাইলে আবু ইসহাকের স্ত্রী তাকে ছয়শত দিরহামে ক্রয় করে। এ সংবাদ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট পৌঁছেলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, যায়েদ ইবন আরকামের রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদের সওয়াব বাতিল হয়েছে। অবশ্য তাওবা করলে সাওয়াব বাতিল হবে না।

তাদের দলীল এই যে, শাস্তি নির্ধারণ করা আমলী বা কার্যগত বিষয়, সুতরাং এটা ইলম বা দৃঢ় জ্ঞান লাভ হয় এমন অকাট্য দলীল দ্বারাই সাব্যস্ত হতে হবে। তাছাড়া কোনো কাজের ব্যাপারে যখন সেটার হুকুম ইজতিহাদমূলক হয়, তখন যিনি তা করবেন তার সাথে শাস্তি সম্পৃক্ত হবে না।

সুতরাং তাদের কথানুযায়ী, শাস্তি সম্পর্কীয় হাদীস দ্বারা কাজটি হারাম হওয়ার দলীল হয়। কিন্তু অকাট্য প্রমাণ ছাড়া শাস্তি প্রযোজ্য হয় না।

অনুরূপ আরও একটি উদাহরণ হচ্ছে, আলিমগণ এমন কতকগুলো অপ্রসিদ্ধ কিরায়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, যা কোনো কোনো সাহাবী থেকে সহীহ বলে বর্ণিত আছে। অথচ ঐ সব কিরায়াত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক লিপিবদ্ধ কুরআনে নেই। কেননা এসব কিরায়াত আমল ও ইলম শামিল করে, যদিও সেগুলো বিশুদ্ধ খবরে ওয়াহেদ।

আলিমগণ সেগুলো দ্বারা আমল করার জন্য দলীল প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু সেটাকে কুরআনের অংশ হিসেবে গণ্য করেন নি। কেননা কুরআনের অংশ প্রমাণ করা ইলমী তথা দৃঢ়জ্ঞানের বিষয়, যা হতে হলে অকাট্য দলীলের প্রয়োজন[79]।

দ্বিতীয় মত

---

[79] সুতরাং তাদের নিকট এ জাতীয় হাদীস দ্বারা আমল প্রতিষ্ঠা পেলেও তা দ্বারা শাস্তির ধমকিজনিত বিধান প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। [সম্পাদক]

অপরপক্ষে সালাফে সালেহীন এবং অধিকাংশ ফকীহের মতে, এসব হাদীসে যে শাস্তির উল্লেখ রয়েছে, তা ধমকির ব্যাপারেও যথার্থ দলীল হিসেবে গৃহীত হবে। কেননা সাহাবীগণ এবং পরবর্তী সময় তাবে'ঈগণ সর্বদাই এসব হাদীস দ্বারা আমল প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে শাস্তির বিধানও প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যারা এ ধরণের আমল করবে তাদের ওপর মোটামুটিভাবে[80] শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তাদের হাদীস ও ফাতওয়ায় এ মত ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে আছে।

এটা এ জন্য যে, শাস্তির ধমকিও শরী'আতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আর শরী'আতের হুকুম কখনও প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, আবার কখনও অকাট্য দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। কেননা শাস্তির ধমকির ব্যাপারে পূর্ণ দৃঢ় প্রত্যয় অর্জন উদ্দেশ্য নয়, বরং এমন বিশ্বাসই যথেষ্ট দৃঢ় প্রত্যয় আসে অথবা যাতে প্রধান্যপূর্ণ ধারণা লাভ হয়। আর আমল সম্পর্কিত হুকুমের বেলায়ও একই অবস্থা চাওয়া হয়ে থাকে[81]।

---

[80] অর্থাৎ বিস্তারিত কিছু নির্ধারণ না করে যেভাবে ধমক এসেছে, সেভাবেই ধমকটিকে রেখে দেওয়া। সেটির ব্যাপারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষনে না যাওয়া। [সম্পাদক]

[81] সুতরাং 'আহকামে আমলিয়া' বা কার্যগত আমলের ক্ষেত্রে যেমন খবরে ওয়াহেদ দ্বারা দলীল পেশ করে সেটা দ্বারাই বিধান প্রযোজ্য হয়, তেমনি ধমকিগত আমলের ক্ষেত্রেই একই অবস্থা হবে। সেখানে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। তাই এটা বলা যায় যে, কোনো শাস্তির ধমক যদি খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে আসে, তবে হাদীস

মানুষের এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এটি হারাম করেছেন এবং ঐ হারাম কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে সংক্ষিপ্ত ভীতি প্রদর্শণ করেছেন; আর এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এটা হারাম করেছেন এবং তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির ওয়াদা করেছেন, এই উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা উভয়টিই (কোনো কিছু হারাম করা ও অনির্ধারিত শাস্তির ওয়াদা এবং কোনো কিছু হারাম করা কিংবা তার ওপর নির্ধারিত শাস্তির ওয়াদা করা) আল্লাহর পক্ষ হতে খবর হিসেবে প্রদত্ত। সুতরাং শর্তমুক্ত দলীল দ্বারা প্রথম ব্যাপারে খবর দেওয়া যেমন জায়েয, তেমনিভাবে দ্বিতীয়টির ব্যাপারেও খবর দেওয়া জায়েয। বরং যদি কেউ বলে: শাস্তির ব্যাপারে ধমকি যেখানে এসেছে সেটার ওপর আমল করাই অধিক যুক্তপূর্ণ, তাহলে তার কথা বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। আর এ জন্যই আলিমগণ তারগীব (আগ্রহ সৃষ্টিকারী) ও তারহীব (সাবধানকারী) হাদীসের সনদের ব্যাপারে যে রকম ছাড় দেন, বিধি-বিধান সংক্রান্ত হাদীসের ক্ষেত্রে সেরকম ছাড় দেন না। কেননা শাস্তির ধমকি থাকার বিশ্বাস মানব প্রবৃত্তিকে সে কাজ থেকে বিরত রাখে।

তারপর যদি হাদীসে বর্ণিত শাস্তিটির ধমকি বাস্তবে পরিণত হয়, তবে লোকটি (ভয় করে সে কাজ না করার কারণে) বেঁচে গেল। আর যদি শাস্তির ধমকি বাস্তবে না ঘটে, বরং দেখা গেল যে, ঐ কাজের পরিণতি হিসেবে যে শাস্তি দেওয়ার কথা ছিল সেটা না দিয়ে তাকে হালকা শাস্তি

বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে মৌলিকভাবে সেই কাজটি যেমন হারাম বলে ধর্তব্য হবে, তেমনি যে এ কাজ করবে তার ওপর সেই ধমকিও আরোপিত হবে। [সম্পাদক]

দেওয়া হচ্ছে, তাহলে তার যে বিশ্বাস ছিল যে এ কাজ করলে বেশি শাস্তি ভোগ করতে হবে, সেটা লোকটির কোনো ক্ষতি করল না; যখন সে কাজটিকে ক্ষতিকর মনে করে পরিত্যাগ করবে। কারণ, যদি বিশ্বাস করে যে এর দ্বারা শাস্তি কম হবে, তাহলেও তা ভুল সাব্যস্ত হতে পারে, অনুরূপভাবে যদি হাদীসের বাড়তি ধমকির ব্যাপারে যদি হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বিশ্বাস করল না তাও তো ভুল প্রমাণিত হতে পারে[82]।

অতঃপর শাস্তি সম্পর্কিত এই ভুল ধারণা অর্থাৎ কাজের পরিণামে আসল শাস্তি কম ধারণা করা কিংবা শাস্তির ধমকির বিষয়ে হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বিশ্বাস না করলে, কাজটি তার কাছে হাল্কা মনে হতে পারে ফলে সে ঐ কাজে লিপ্ত হতে পারে। তারপর যদি বাড়তি শাস্তি সাব্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে সে অধিকতর শাস্তির সম্মুখীন হবে। অথবা সে শাস্তি পাওয়ার একটি কারণ তার মধ্যে বিদ্যমান তা বলা যাবে।

সুতরাং শাস্তি সম্পর্কিত এ ভুল উভয় অবস্থাতেই (শাস্তি প্রযোজ্য হওয়ার ওপর বিশ্বাস রাখা এবং বিশ্বাস না রাখা) সার্বিকভাবে সমান। তবে শাস্তি

[82] সুতরাং সবচেয়ে সাবধানতার কথা হচ্ছে এটা বিশ্বাস করা যে, যে কাজের মধ্যে শাস্তির ধমক এসেছে সে কাজটি হারাম এবং যে শাস্তির ধমক সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে সেটাকে সেভাবেই বিশ্বাস করা যে এর দ্বারা শাস্তি হবে। এর মাধ্যমে হাদীসের ওপর আমল করা হয়ে যাবে। তার বিপরীতটি হলেই তো সমস্যা। যেমন, বিশ্বাস করা হলো যে, শাস্তির ধমকি আসার কারণে কাজটি হারাম হলেও কাজটির কারণে শাস্তি দেওয়া হবে না, তাহলে যদি শেষে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ এর জন্য আসলেই শাস্তি রেখেছেন তাহলে কী অবস্থা হবে! [সম্পাদক]

প্রযোজ্য হওয়ার বিশ্বাস রাখা আজাব (শাস্তি) হতে পরিত্রাণের বেশি নিকটবর্তী। তাই এ অবস্থাটিই অধিকতর শ্রেয়।

আর এ নীতির ওপর ভিত্তি করেই অধিকাংশ আলিম হারামের দলীলটিকে হালালের দলীলের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং তার ওপর ভিত্তি করেই বহু ফিকহ শাস্ত্রবিদ শরী‘আতের আহকামের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতেন।

আর কোনো কাজ সম্পাদনে ‘ইহতিয়াত্ব’ তথা ‘সাবধানতা অবলম্বন’ এর বিষয়টি মৌলিকভাবে যে ভালো, এ ব্যাপারে বিবেকবান প্রায় সবাই একমত।

অতঃপর যদি কোনো ব্যক্তির মনে ‘শাস্তিতে পতিত না হওয়ার’ মধ্যে ভুল করার বিশ্বাসটি ও তার বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ ‘শাস্তিতে পতিত হওয়ার’ মধ্যে ভুল করার বিশ্বাসকে দাড় করানো যায়, তবে তার বিশ্বাসের পক্ষে যে দলীল রয়েছে এবং তার বিশ্বাসের কারণে নাজাত পাওয়া সংক্রান্ত দলীল দু’টি কোনো প্রকার বিরোধিতা থেকে মুক্ত থাকবে[83]।

---

[83] অর্থাৎ প্রথমোক্ত দলীল দু’টি পরস্পর বিরোধী হয়ে বাদ পড়লেও পরবর্তী দু’টো দলীল বিরোধিতা থেকে মুক্ত থাকার কারণে সেটার উপর আমল করা বাধ্য করে। সুতরাং এসব মৌলিক শাস্তির ধমকিযুক্ত হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী শাস্তিতে পতিত হওয়ার যে মতটি অধিকাংশ সত্যনিষ্ঠ আলিমগণ গ্রহণ করেছেন, তা সাব্যস্ত হয়ে গেল।

কোনো লোকের এরূপ বলা ঠিক হবে না যে, শাস্তির জন্য অকাট্য দলীল না থাকা শাস্তি প্রযোজ্য না হওয়ার প্রমাণ; যেমন, কুরআনের অতিরিক্ত কিরা'আতের জন্য খবর-ই-মোতাওয়াতের না থাকা ঐ কিরা'আতগুলো শুদ্ধ না হওয়ার দলীল। কথকের এই কথা ঠিক নয়। কেননা (কোনো সুনির্দিষ্ট) দলীল না থাকা দলীলকৃত বস্তু না থাকা বুঝায় না।

যে ব্যক্তি ইলম তথা আকীদা বিষয়ক কাজে সেটার অস্তিত্বের পক্ষে অকাট্য দলীল না থাকার কারণে ঐ বস্তুকে অস্তিত্বহীন বলে সিদ্ধান্ত নেয়, যেমনটি একদল মুতাকাল্লিমের অনুসৃত পথ, সে ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে সুস্পষ্টভাবে ভুল করল।

কিন্তু যখন আমরা জানতে পারি, কোনো বস্তুর অস্তিত্ব এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে, অনিবার্যভাবে তার দলীল পাওয়া যাবে, তারপর যখন জানলাম যে, দলীল নেই, অতএব আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারব যে, বস্তুটিও অস্তিত্বহীন। কেননা অনিবার্যকারী না থাকাটাই অনিবার্যিত বস্তু না থাকার প্রমাণ।

আর আমরা এও জানতে পেরেছি যে, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর দীনকে আমাদের কাছে বর্ণিত ও প্রচার-প্রসার হয়ে আসার পক্ষে যথেষ্ট কারণসমূহ রয়েছে। কেননা মুসলিমদের জন্য মানুষের কাছে সাধারণ দলীল হিসেবে পৌঁছে যাওয়া প্রয়োজন এমন কিছু গোপন করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। সুতরাং (উদাহরণ হিসেবে) যখন আমাদের কাছে ষষ্ঠ সালাত হিসেবে সাধারণভাবে কোনো কিছু বর্ণিত হয়ে আসে নি, অনুরূপভাবে (সুনির্দিষ্ট সূরার বাইরে) অন্য কোনো সূরার কথা বর্ণিত

হয় নি, তখন আমরা দৃঢ়ভাবে জানতে পারলাম যে, ইসলামে ছয় ওয়াক্ত ফরয সালাতও নেই এবং কুরআনে বর্ণিত সূরা ছাড়া অন্য কোনো সূরাও নেই।

কিন্তু শাস্তি প্রযোজ্য অধ্যায়টি এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা প্রত্যেক কাজের শাস্তির বর্ণনা আমাদের কাছে ধারাবাহিকভাবে ও মোতাওয়াতের বিশুদ্ধভাবে পৌঁছবে, তা যেমন জরুরী নয়, তেমনিভাবে সে কাজের ওপর নির্ধারিত শাস্তির হুকুমটিও ধারাবাহিক ও মোতাওয়াতের হওয়া শর্ত নয়।

উল্লিখিত বর্ণনায় বুঝা গেল, যে সমস্ত হাদীস শাস্তির ইংগিতবহ, তাতে আমল করা ওয়াজিব। সুতরাং বিশ্বাস করতে হবে যে, ঐ কাজের আমলকারীকে ঐ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু শাস্তি প্রযোজ্য হবার জন্য কতকগুলো শর্ত রয়েছে, আরও রয়েছে কিছু প্রতিবন্ধকতা[84]।

এই নীতিটি কতগুলো উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা যায়:

---

[84] মোটকথা, যখনই কোনো ব্যাপারে ধমকিসূচক হাদীস পাওয়া যাবে, তখন সে কাজটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। তবে যে ধমকিটি এসেছে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যার মতে তা যদি খবরে ওয়াহেদ দ্বারাও হয়, তবুও সেটাকে ধমকিতে পতিত হওয়ার উপর মৌলিকভাবে প্রমাণবহ মনে করতে হবে। হ্যাঁ, হয়ত ধমকিতে পতিত হওয়ার কোনো শর্ত পূরণ না হওয়া বা প্রতিবন্ধকতা থাকা জনিত কারণে সেটা কখনও কখনও ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। [সম্পাদক]

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুদ্ধ বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে:

«لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ»

"সুদখোর, সুদদাতা, স্বাক্ষীদ্বয় ও এর লেখকের ওপর আল্লাহ লা'নত করেছেন"[85]।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরও বিভিন্ন পন্থায় বর্ণিত আছে: তিনি ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, এক ছা' এর পরিবর্তে দুই ছা' খাদ্য নগদ বিক্রি করেছিল,

«أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا»

'হায় হায়, এতো সুদই'।[86] তাছাড়া তিনি এও বলেছেন:

«الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»

"গমের পরিবর্তে গম নগদ মূল্য ছাড়া সুদের পর্যায়ভুক্ত"[87]।

---

[85] মুসনাদে আহমাদ, ১/৪০২। তবে মূল হাদীসটি অন্য শব্দে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। সেখানে 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন' এভাবে এসেছে। [সম্পাদক]

[86] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩১২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৯৪। তবে শব্দ মুসলিমের। অর্থাৎ সম বস্তুর বিনিময় বাকীতে অথবা অতিরিক্ত পরিমানের মাধ্যমে সম্পন্ন হলে তা সুদ হবে, নগদ হলে সুদ হবে না।

[87] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৮৬।

উল্লিখিত হাদীস সুদের উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি হচ্ছে, সমগোত্রীয় বস্তুর বিনিময়ে বেশি প্রদানজনিত সুদ। অন্যটি হচ্ছে, বাকী বিক্রয় করে পরে দাম বাড়িয়ে নেওয়া সংক্রান্ত সুদ।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ"সুদ হলো বাকী বিক্রয়ের (পর সময়ের কারণে পরবর্তীতে অর্থ বাড়িয়ে দেওয়ার) মধ্যে"[88], যাদের কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে, তারা এক সা' এর পরিবর্তে দুই ছা' এর নগদ বিক্রয়কে হালাল মনে করতেন। এই রায় হলো ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সংগীগণের, আবুস শা'ছা', 'আতা, তাউস, সা'ঈদ ইবন জুবাইর, ইকরামা ও অন্যান্যগণ। যারা ইলম ও 'আমলে মুসলিম জাতির গৌরব ছিলেন। এখন কারও জন্য একথা বলা জায়েয হবে না যে, উল্লিখিত সাহাবী ও তাদের অনুসারীগণ, সুদ সম্পর্কিত হাদীসে সুদখোরদের পর্যায়ভুক্ত ও অভিশপ্ত। কেননা তারা উল্লিখিত ফাতওয়া দিয়েছিলেন মোটামুটিভাবে একটি গ্রহণযোগ্য তাবিল তথা ব্যাখার ওপর ভিত্তি করে।

২. অন্য একটি উদাহরণ এই যে, মদীনার কতিপয় আলিম হতে স্ত্রীর পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাসের কথা বর্ণিত আছে। অথচ সুনান-ই- আবু দাউদে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

---

[88] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৯৬। তবে অবশ্যই এটা বুঝতে হবে যে, বর্ণনাকারী হাদীসের একটি অংশ শুনেছেন। এর দ্বারা সমগোত্রীয় অতিরিক্ত আদান-প্রদান জনিত সুদকে অস্বীকার করা হয় নি। [সম্পাদক]

«مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»

“যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পিছনের রাস্তা দিয়ে যৌন সহবাস করে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ বস্তুকে অস্বীকার করল)[89]।” কিন্তু কারও পক্ষে কী এটা বলা সমীচীন হবে যে, ঐ (মদীনার) আলিমগণের অমুক কিংবা অমুক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ বস্তুর সাথে কুফুরী করেছে?[90]

৩. এভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে,

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا...» الحديث.

“তিনি শরাবের ব্যাপারে দশ ব্যক্তিকে লা‘নত (অভিশাপ) করেছেন। তাতে মদ প্রস্তুতকারী, প্রস্তুতে সাহায্যকারী ও পানকারী ... ইত্যাদি সকল প্রকার লোকই শামিল”[91]।

[89] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯০৪; (সংক্ষেপিত); তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৬৩৯; মুসনাদে আহমাদ ২/৪৭৬।

[90] অর্থাৎ মদীনাবাসীদের মধ্যে যে সব আলেম তা করেছে বলে কেউ কেউ বর্ণনা করে থাকেন, তাদেরকে সে ধমকির অন্তর্গত কাফির বলার সুযোগ নেই। কারণ, তাদের কাছে হয়ত সে হাদীস পৌঁছে নি। কিন্তু যারা এ কাজ করবে, তারা হারাম করেছে বলে ধর্তব্য হবে এবং মৌলিকভাবে ধমকির আওতায় পড়বে।

[91] মুসনাদে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী।

আরও বিভিন্ন পন্থায় বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

“এমন পানীয় যাতে নেশা আসে, সেটাই হারাম”[92]।

তিনি আরও বলেন,

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»

“প্রত্যেক নেশাযুক্ত বস্তুই মদ”[93]।

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে মুহাজিরীন ও আনসারদের মধ্যে খুৎবা দিতে গিয়ে বলেন:

«وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ»

“যে বস্তু বিবেককে আচ্ছন্ন করে, তাই মদ”। আর আল্লাহ মদ হারাম হবার আয়াত নাযিল করেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময়কার অবস্থা ছিল এই যে, তৎকালে মদীনায় মদ পান করা হতো, তবে তাদের সে মদ ফাদীখ বা কাঁচা-পাকা খেজুর দিয়েই কেবল তৈরি হতো। আঙ্গুরের রসের শরাব তৈরির কোনো ব্যবস্থাই ছিল না।

---

[92] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০০১।

[93] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০০৩।

অথচ মুসলিম জাতির মধ্যে ইলম ও ‘আমলের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ কতিপয় কুফাবাসী এ বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, আঙ্গুর ব্যতীত মদ হয় না। আর খেজুর ও আঙ্গুর ব্যতীত অন্যান্য ফলের রস নেশা পরিমান না হলে হারাম হবে না। তারা হালাল ধারণা করে সেটা পানও করতেন। এতদসত্ত্বেও, বলা যাবে না যে, ঐসব লোকরা হাদীসে বর্ণিত শাস্তির ধমকির অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাদের ওযর ছিল এবং তারা তাবীল বা ব্যাখ্যা করে তা করেছে অথবা তাদের অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতাও থাকতে পারে।

তাছাড়া এও বলা উচিৎ নয় যে, তারা যে মদ পান করেছে তা সে মদের অন্তর্ভুক্ত নয় যার পানকারীকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। কেননা (মদ হারামের ব্যাপারে) সাধারণ যে নির্দেশনা এসেছে (তারা তা’বীল করে যা পান করেছে) তা সেগুলোকেও সমভাবে শামিল করে। আর এটাও জানা যে, তখনকার দিনে মদীনায় আঙ্গুরের মদ তৈরি হতো না।

৪. তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ বিক্রেতাকে অভিশাপ দেন। এতদসত্ত্বেও কোনো কোনো সাহাবী মদ বিক্রয় করেছেন। এ সংবাদ উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, ‘অমুককে আল্লাহ ধ্বংস করুন, সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

“ইয়াহূদীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা গুলিয়ে বিক্রি করতো”[94] ও “তার মূল্য ভোগ করতো”[95]।

মদ বিক্রেতা সাহাবীর জানা ছিল না যে, সেটা বিক্রি করা হারাম। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ সাহাবীর এ বিষয়টি যে অজানা তা জানা সত্ত্বেও ঐ কাজের শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করা থেকে পিছপা হন নি। যাতে করে সে সাহাবী ও অন্যান্যরা যখন তা জানবে তখন তা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

৫. তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুরের রস নিংড়ানো ব্যক্তি এবং যার জন্য রস নিংড়ানো হয়, উভয়কেই লা'নত করেছেন। অথচ বহু সংখ্যক ফকীহ্ অন্যের জন্য আঙ্গুরের রস নিংড়ানো জায়েয মনে করেন, যদিও ঐ ব্যক্তি জানে যে, ঐ রস দিয়ে মদ তৈরি করা হবে।

হাদীসের ‘নস’ দ্বারা এটা সহজেই বোঝা যায় যে, হাদীসটি রস নিংড়ানো ব্যক্তির অভিশপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য দলীল, যদিও ঐ কর্মে লিপ্ত ব্যক্তির ওপর হুকুমটি (অভিশপ্ত হওয়ার বিষয়টি) বর্তাবে না। কারণ, সেখানে এ হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে (আর তা হচ্ছে, সে বিধান সম্পর্কে না জানা)।

---

[94] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৮২।

[95] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৮৩।

৬. অনুরূপভাবে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরচুলাধারীনি স্ত্রীলোক এবং যে অন্যের জন্য পরচুলা তৈরি করে, উভয়কে অভিশাপ দিয়েছেন। অথচ কতিপয় ফকীহ্র মতে এ কাজ শুধু মাকরূহ।

৭. তদ্রূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»

“যারা রৌপ্যের পাত্রে পানি পান করে, তারা নিজেদের পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুন সশব্দে প্রবেশ করায়”[96]। এতদসত্ত্বেও কোনো কোনো ফকীহ এটাকে মাকরূহ তানজিহ মনে করেন।

৮. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

«إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»

“যখন দুই মুসলিম তাদের তরবারী নিয়ে একে অন্যের সামনাসামনি হয়, তখন ঘাতক ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যাবে”[97]।

না হক মুমিনদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে উল্লিখিত হাদীসের আমল করা ওয়াজিব। এতদসত্ত্বেও, আমরা জানি যে, উষ্ট্র যুদ্ধে এবং সিফফীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণ জাহান্নামবাসী নন।

---

[96] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৬৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৪১৩; মুসনাদে আহমাদ ৬/৩০৬। তবে শব্দ ইমাম আহমাদের।

[97] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৮৮।

কেননা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে তাদের ওযর এবং ভিন্ন ব্যাখ্যা ছিল। এছাড়াও তারা এমন সব সৎ কাজ করেছিলেন, যা তাদের জাহান্নামের প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড়িয়েছিল।

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ হাদীসে বলেছেন:

«ثَلاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم، رجل على فضل مَاء يمنعه من ابْن السَّبِيل، فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي، كما منعتَ فضل ما لم تعمل يداك، رجلٌ بَايع إِمَامًا لايبايعه إلا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ سَخَطَ وَرَجُلٌ حلف على سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ كاذباً، لقد أعطي بها أكثر مما أعطي»

“আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তিন শ্রেনীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ হতে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি অবধারিত রয়েছে। যে ব্যক্তি পথিককে অতিরিক্ত পানি দিতে অসম্মতি জানায় কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা‘আলা তাকে বলবেন-আজ আমি তোমাকে আমার করুনা ও রহমত হতে বঞ্চিত রাখব, যেমন ভাবে তুমি মানুষকে অতিরিক্ত পানি হতে বঞ্চিত করতে, যা তোমার শ্রমলব্ধ নয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি শুধু পার্থিব স্বার্থের জন্য ইমামের হাতে আনুগত্যের বাই‘আত বা বশ্যতা স্বীকার করে, তাকে কিছু দেওয়া হলে খুশী হয়, আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। তৃতীয় ব্যক্তি তার মাল অতিরিক্ত দামে বিক্রয় করার জন্য আছরের

পর মিথ্যা শপথ করে যে, ইতোপূর্বে তার মালের বেশি দাম বলা হয়েছিল।”[98]

উক্ত হাদীসের অতিরিক্ত পানি দান করতে অসম্মতি জানালে ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে বলে ধমকি দেওয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও একদল আলিম অতিরিক্ত পানি দিতে নিষেধ করাকে জায়েয মনে করেন।

কিন্তু হাদীসের দলীল অনুসারে, ঐ কাজ আমাদেরকে হারামই বলতে হবে। এতদসত্ত্বেও, যে ঐ কাজ জায়েয মনে করে, তার ওপর শাস্তির ধমকি প্রযোজ্য হবে না। কেননা তাবীল তথা ভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে তার ওযর কবুল করতে হবে।

১০. অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»

“যে ব্যক্তি অন্য কারও জন্য হালাল করার নিয়তে কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ওপর অভিশাপ দেন। আর যে ব্যক্তির জন্য ঐ স্ত্রী লোকটিকে হালাল করা হয়, তার ওপরও আল্লাহর লা‘নত বা অভিশাপ”[99]। এটা একটি সহীহ হাদীস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন বর্ণনায় এবং সাহাবীগণ হতেও এরূপ বর্ণিত

---

[98] মুসনাদে আহমাদ, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম। তবে উপরোক্ত হাদীসের শব্দ কয়েকটি বর্ণনা থেকে চয়নকৃত। [সম্পাদক]

[99] আবু দাউদ, হাদীস নং ২০৭৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৯৩৬।

আছে। এতদসত্ত্বেও, কতিপয় আলিম হালাল করার জন্য এ বিয়ে নিঃশর্তভাবে সহীহ বলে থাকেন।

আবার কেউ ঐ প্রকার বিয়ে এই শর্তে জায়েয রাখেন, যদি বিয়ের ‘আকদ’ এর সময় কোন প্রকার শর্ত না করা হয়। তাদের এই কথার পেছনে বহু বিখ্যাত ওযর আছে।

কেননা প্রথম দলটি (যারা হীলা বিয়ে নিঃশর্তভাবে সহীহ বলে থাকেন), তাদের মূলনীতির কিয়াস হচ্ছে, শর্তের কারণে বিয়ে-বন্ধন বাতিল হয় না; যেমনিভাবে আকদ তথা বিনিময় চুক্তির কোনো একটি অজানা থাকলেও সে চুক্তি বাতিল হয় না।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দলটি, (যারা আকদের সময় শর্ত না করা হলে এ বিয়ে সহীহ বলে থাকেন) তাদের মূলনীতির কিয়াস হচ্ছে, শর্তমুক্ত কোনো আকদ কখনও আকদের বিধান পরিবর্তন করে না।

বস্তুতঃ (যারা এ বিয়ে বিশুদ্ধ বলেন), তাদের কাছে হারাম সম্পর্কিত হাদীস পৌঁছে নি। কেননা তাদের পুরাতন কিতাবসমূহে ঐ হাদীস নেই। এটিই হচ্ছে প্রকাশ্য কথা।

হ্যাঁ, যদি তাদের কাছে এ হাদীস পৌঁছত, তা হলে অবশ্যই তারা ঐ হাদীস তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করতেন এবং এ হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন অথবা ঐ হাদীসের জবাব দিতেন। আবার এটাও সম্ভব হতে পারে যে, তাদের কাছে হাদীসটি পৌঁছেছে, কিন্তু তারা তার তাবিল করেছেন। অথবা উক্ত হাদীসকে মনসূখ বা রহিত বলে বিশ্বাস

করেছেন। আবার এও সম্ভব হতে পারে যে, এই হাদীসের বিপক্ষে বিপরীতে দাঁড়ানোর মত তাদের নিকট অন্য কিছু ছিল।

উল্লিখিত বর্ণনায় এটি প্রতীয়মাণ হয় যে, উল্লিখিত লোকগণ হাদীসে বর্ণিত শাস্তির সম্মুখীন হবে না, যদিও তারা উল্লিখিত কোনো কারণে 'তাহলীল' (অন্য কারও জন্য স্ত্রী হালাল) করার কাজটি জায়েয বিশ্বাসে করে থাকে।

অবশ্য আমাদের এটা বলতেই হবে যে, উক্ত 'তাহলীল' বা হালাল করাই শাস্তির কারণ, যদিও শর্তের অভাবে অথবা প্রতিবন্ধকতার ফলে কোনো কোনো লোকের ওপর এই শাস্তি প্রযোজ্য হয় না।

১১. এরূপভাবে মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু জিয়াদ ইবন আবিহকে নিজের (বংশের) সাথে সম্পৃক্ত করেন; যদিও প্রকৃতপক্ষে এই জিয়াদ হারিস ইবন কালদাহ এর বিছানায় জন্মগ্রহণ করেন। কেননা আবু সুফিয়ান বলতেন: জিয়াদ আমার বীর্যে জন্মলাভ করেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أنه غير أبيه، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»

"যে ব্যক্তি নিজেকে পিতা ব্যতীত অন্য কারও সন্তান বলে সম্পর্কযুক্ত করে; অথচ সে জানে যে, এ লোকটি তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম"[100]।

[100] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৩; মুসনাদে আহমাদ ১/১৭৯।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

«مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ تولى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا»

"যে ব্যক্তি অপরকে পিতা বলে দাবী করে অথবা নিজের মুনিব থাকা সত্ত্বেও অন্য মুনিবের বশ্যতা স্বীকার করে, তার ওপর আল্লাহ, মালাইকা ও সকল মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তার কোনো ফরয ও নফল ইবাদত কিছুই কবুল করবেন না।"[101] এটি একটি বিশুদ্ধ হাদীস। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বিধান দিয়েছেন যে, 'সন্তান ঐ ব্যক্তির প্রাপ্য, যার বিছানায় (অর্থাৎ যার স্ত্রী বা ক্রীতদাসীর পেটে ঐ সন্তান ভুমিষ্ট হয়েছে)। এটি নিঃসন্দেহে একটি ইজমা' তথা ঐকমত্যের বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

এতে করে আমরা বুঝি যে, যে ব্যক্তি তার পিতা (যার ঘরে সে জন্মেছে তাকে) ছাড়া অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করে, সে ঐ হাদীসে উল্লিখিত শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এতদসত্ত্বেও, আমরা নির্দিষ্ট কোনো সাধারণ ব্যক্তিকে এজন্য দায়ী করতে পারি না। সাহাবীদেরকে অভিযুক্ত করাতো দূরের কথা। অর্থাৎ সাহাবীদের কাউকেও বলা যাবে না যে, তিনি এই শাস্তির যোগ্য। কেননা সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ্র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা, "আল-ওয়ালাদু লিল ফিরাশ" অর্থাৎ 'সন্তান যার স্ত্রীর পেটে হয়েছে, তারই প্রাপ্য' এটি তাদের কাছে পৌঁছে

---

[101] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭০; মুসনাদে আহমাদ ৪/১৮৭; শব্দ ইমাম আহমাদের।

নি। বরং তারা বিশ্বাস করছিল যে, সন্তান ঐ ব্যক্তিরই হবে যে তার মাকে গর্ভে প্রদান করেছে, আরও বিশ্বাস করেছে যে, আবু সুফিয়ানই তো উম্মে যিয়াদ সুমাইয়ার গর্ভে বীর্য প্রদান করে সেটার জন্ম দিয়েছে।

এই বিধান অনেক লোকের কাছেই অজানা থাকতে পারে। বিশেষ করে, হাদীস সংকলনের প্রসার লাভের পূর্বে বেশির ভাগ লোক এই বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তাছাড়া এও হতে পারে যে, ইসলামের পুর্ব যুগে সন্তান ঐ ব্যক্তিরই প্রাপ্য ছিল, যার বীর্যে সে জন্মলাভ করেছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাও থাকতে পারে যা ঐ কাজের শাস্তি প্রয়োগে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, যেমন, তিনি এমন কতিপয় নেক কাজ করেছেন, যার ফলে ঐ গুনাহ মুছে গেছে। ইত্যাদি।

এ এক প্রশস্ত বিভাগ। কেননা যে সব বিষয় কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা হারাম করা হয়েছে, অথচ কতিপয় আলিম তাকে হালাল মনে করেন সে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, হয় তাদের কাছে হারামের দলীল পৌঁছে নি, ফলে তারা সেগুলোকে হালাম মনে করেছেন অথবা তাদের কাছে সেসব দলীল পৌঁছেছে, কিন্তু সেটার বিপরীতে দাঁড়ানোর মতো এমন দলীল তাদের কাছে ছিল যা (তাদের নিকট) সে (হারামের) দলীলের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে। অবশ্য তারা এটা তাদের জ্ঞান ও বিবেকের দ্বারা ইজতিহাদের মাধ্যমেই করেছেন।

হারামের হুকুম ও ফলাফল

কোনো বস্তুকে হারাম বলার সাথে কতগুলো বিধান ও ফলাফল জড়িত। যেমন,

১. হারামে লিপ্ত ব্যক্তি গুনাহগার হবে।

২. ঐ ব্যক্তি ভর্ৎসনার পাত্র।

৩. সে শাস্তির উপযুক্ত এবং

৪. সে ফাসিকের পর্যায়ভুক্ত।

এগুলো ছাড়া অন্যান্য ফলাফলও রয়েছে। কিন্তু হারাম বলার জন্য কতগুলো শর্ত ও কিছু প্রতিবন্ধকও রয়েছে। যেমন, কখনও কোনো বস্তুর হারাম প্রমাণিত হয়, কিন্তু হারাম হবার কোনো শর্তের অনুপস্থিতিতে বা কোনো প্রতিবন্ধকতার ফলে হারামের হুকুম দেওয়া যায় না। অথবা ঐ হারাম কোনো নির্দিষ্ট লোকের বেলায় প্রযোজ্য হয় না, অথচ অন্যের বেলায় তা প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

এই বিষয়ে আমরা কথার পুনরাবৃত্তি করলাম; কেননা উক্ত মাসআলায় মানুষ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত:

১. সকল সালাফে সালেহীন ও ফকীহগণের মত এই যে, আল্লাহর বিধান একটিই। তবে যিনি গ্রহণযোগ্য ইজতেহাদের মাধ্যমে এর বিরোধিতা করলেন, তিনি ভুল করলেন, তার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে এবং তিনি সাওয়াবপ্রাপ্ত হবেন।

সুতরাং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে ব্যক্তি এই কাজটি করবে, সে হারাম কাজটিই করেছে, তবে তার ওপর হারামের প্রতিক্রিয়া হবে না।

কেননা আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ কাউকে তার শক্তির অতিরিক্ত কষ্ট দেন না।

২. আলিমগণের দ্বিতীয় দলের ধারণা এই যে, ঐ কাজটি মুজতাহিদের জন্য হারাম নয়। কেননা হারামের দলীল তার কাছে পৌঁছে নি, যদিও তা অন্যের জন্য হারাম। সে হিসেবে ঐ লোকটির জন্য সে কাজ হারাম বলে বিবেচিত হবে না।

উল্লিখিত মত দু'টি কাছাকাছি, এটা শব্দ চয়নের ভিন্নতার মতই। (যার মূল অর্থে পার্থক্য নেই)

মোটকথা, শাস্তির ধমকি সম্পর্কিত হাদীসসমূহের ব্যাপারেও উপরোক্ত কথা বলা যাবে, যখন তার (محل) স্থানে কারও মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ, আলিমগণ এসব হাদীস দ্বারা যে কাজটি করার ব্যাপারে ধমকি এসেছে সে কাজটি হারাম হওয়ার ওপর দলীল গ্রহণে ইজমা' তথা একমত হয়েছেন। চাই সে কাজের স্থানটি ঐকমত্যের স্থান হোক বা মতপার্থক্যের স্থান হোক।

বরং মতপার্থক্যের স্থানেই এ সব হাদীস দ্বারা বেশিরভাগ দলীল গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

কিন্তু তারা এসব হাদীস ধমকিতে পতিত হওয়ার ওপর প্রমাণবহ কিনা এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন, যদি না তা কাত'ঈ বা অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হবে। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

শাস্তির ধমকি যেসব হাদীসে এসেছে তা শুধু ঐকমত্যের স্থানকেই শামিল করে না, বরং মতপার্থক্য রয়েছে এমন স্থানকেও শামিল করে

এখন যদি এ প্রশ্ন করা হয়, এটা কেন বলা হয় না যে, শাস্তির হাদীস শুধু যেখানে আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে সেখানেই কার্যকর হবে, যেখানে মতপার্থক্য রয়েছে সেসব স্থানে নয়। আর ঐ সমস্ত কাজ, যার কর্তাকে লা'নত (অভিশাপ) দেওয়া হয়েছে অথবা তাতে শাস্তি ও গজবের ভয় দেখানো হয়েছে, তা সেখানেই কার্যকর হবে যেখানে কাজটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। যাতে করে কোনো মুজতাহিদকে, যিনি কোনো বস্তু হালাল বিশ্বাস করে তা করে বসেন, তাকে যেন সে লা'নত কিংবা আযাব বা গযবের ধমকিতে পতিত হওয়ার মুখোমুখি হতে না হয়। বরং হারাম বিষয়কে হালাল বলে বিশ্বাসী তো হারাম কাজের কর্তার চেয়েও বেশি দায়ী। কেননা সে হারাম কাজের আদেশদাতা। সুতরাং সেটা অনুসারে তাকেও শাস্তির, গজবের ও লা'নতের অন্তর্ভুক্ত হতে হয়[102]। (তাই শুধুমাত্র যেখানে

---

[102] সুতরাং যে সব হাদীসে শাস্তির ধমকি এসেছে সেগুলোকে সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য বললে যেহেতু মুজতাহিদকে গযব, লা'নত ও আযাবের সম্মুখীন হতে হয়, সেহেতু কেন এটা বলা হবে না যে, যেখানে কাজটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল আলেম ঐকমত্য পোষণ করেছেন কেবল সেখানেই সেই ধমকিটি কার্যকর হবে, যেখানে কোনো মুজতাহিদ হালাল বিশ্বাসে এ ধরণের কাজ করে বসেছে সেখানে কার্যকর হবে না? এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন, যার উত্তর শাইখুল ইসলাম পরবর্তীতে দিচ্ছেন। [সম্পাদক]

কাজটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল আলিম একমত হয়েছে কেবল সেখানেই শাস্তির ধমকি পতিত হবে সেটা বলা কেন হয় না?)

আমরা বলি, **এর জবাব নিম্নলিখিত উপায়ে দেওয়া যেতে পারে।**

প্রথম জবাব:

মতপার্থক্য রয়েছে এমন কোনো বস্তুর হারাম হওয়ার বিষয়টি দু' অবস্থা থেকে মুক্ত নয়:

ক. মতপার্থক্য রয়েছে এমন বিষয়টি হারাম বলে সাব্যস্ত হবে,

খ. অথবা বিষয়টি হারাম বলে সাব্যস্ত হবে না।

যদি মতপার্থক্য রয়েছে এমন কোনো স্থানেই *হারাম* সাব্যস্ত না হয়, তাহলে এ কথা অনুসারে কোনো বস্তু কেবল তখনই হারাম হতে পারে, যখন সেটা হারাম হওয়ার ওপর সবাই ঐকমত্য পোষণ করে। সে হিসেবে, যে সকল বিষয় হারাম হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য পাওয়া যাবে, সেটা হালাল বিবেচিত হবে।

অথচ এ কথাটি উম্মতের সর্বসম্মত মত *(ইজমা')* এর বিরোধী কথা। দীনে ইসলামে তা নিশ্চিতভাবে বাতিল বলে সবার জানা বিষয়।

কিন্তু যদি অন্তত একটি মতানৈক্যের স্থানে বস্তুটি হারাম বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে মুজতাহিদদের মধ্য থেকে এ হারাম কাজটি যিনি হালাল মনে করেন, তাকে হয় হারাম কাজ করার ও তা হালাল মনে করার নিন্দা ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে অথবা হতে হবে না।

এক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে, তাকে সে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে অথবা যদি বলা হয় যে, সম্মুখীন হতে হবে না, তবে সবার ঐক্যমতে অনুরূপই বলা হবে শাস্তির ধমকিসম্বলিত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হারামের ক্ষেত্রে। (সে অনুসারে) একই সিদ্ধান্ত দিতে হবে দ্বন্দ্বযুক্ত ও মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে শাস্তির ধমকিসম্বলিত বর্ণনার ব্যাপারে, যেমনটি পূর্বে বিশ্লেষণ করেছি।

বরং শাস্তির ধমকি তো এসেছে সে ব্যক্তির জন্য যে (কোনো প্রকার হারামকে হালাল জ্ঞান না করে) এ কাজটি করবে। কিন্তু যে হারাম কাজকে হালাল বলে বিশ্বাস করবে, তার শাস্তি তার থেকেও বড় (হওয়ার কথা,) যে হারাম কাজটি হালাল মনে না করে করবে।

সুতরাং যখন মতপার্থক্যপূর্ণ স্থানেও হারাম সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব, আর যে মুজতাহিদ ব্যক্তি এ হারামকে হালাল মনে করে কাজটি করবে, ওযর থাকার কারণে তার ওপর শাস্তি আপতিত হওয়ার বিষয়টি আসছে না, সেহেতু যে ব্যক্তি এ কাজটি করেছে, (কিন্তু হারামকে হালাল বলে বিশ্বাস করে নি) তার ওপর শাস্তি আপতিত হওয়ার বিষয়টি না আসা আরও বেশি উপযুক্ত কথা। যেমনিভাবে মুজতাহিদ ব্যক্তি হারামকে হালাল মনে করার কারণে সেই হারামকে হালাল করার বিধান যেমন নিন্দা, শাস্তি ইত্যাদির আওতাভুক্ত হবে না, তেমনিভাবে যে এ কাজটি করবে সেও শাস্তির হুমকি-ধমকির সম্মুখীন না হওয়ার কথা। কারণ, বস্তুতঃ শাস্তির হুমকি-ধমকি তো নিন্দা ও শাস্তিরই পর্যায়ভুক্ত বিষয়। সুতরাং এর কিছু পর্যায়ের যে উত্তর দেওয়া হবে, বাকী পর্যায়ের জন্যও সেটা উত্তর হিসেবে বিবেচিত হবে।

আর নিন্দার পরিণাম কম বা বেশি হওয়া কিংবা শাস্তির পরিমাণ কঠোর কিংবা হালকা হওয়া দ্বারা এখানে পার্থক্য করার বিষয়টি আসবে না, কারণ, এ স্থানে নিন্দা ও শাস্তি বেশি হওয়া যেমন দোষণীয় তেমনি অল্প হওয়াও সম পরিমাণ দোষণীয়। কারণ মুজতাহিদ ব্যক্তি এর কারণে অল্প কিংবা বেশি সামান্য পরিমাণও নিন্দা বা শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছে না, বরং তার বিপরীতে তার জন্য রয়েছে সাওয়াব ও পূণ্য।

দ্বিতীয় জবাব

কোনো কাজের হুকুম বা বিধান ইজমা‘ তথা ঐকমত্যের মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়া অথবা মতবিরোধপূর্ণ হওয়া সে কাজের সত্বা ও গুণের বাইরের বিষয়। বরং সেটা আপেক্ষিক বিষয়। তা কিছু সংখ্যক আলিমের (বিপরীত মত) জানা ও না জানার ওপর নির্ভর করে বলা হয়ে থাকে।

আর যখন কোনো (عام) ব্যাপক অর্থবোধক শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হবে, তখন তার (সে ব্যবহারের) জন্য দলীলের উপস্থিতির প্রয়োজন, যাতে বুঝা যায় যে, ঐ শব্দটি নির্দিষ্ট বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সে দলীল দু’ প্রকারে থাকতে পারে:

১. বিশেষ অর্থে নির্দিষ্টকারী এই দলীলটি সাধারণ শব্দের সাথেই সম্পৃক্ত থাকবে। একথা ঐসব লোকদের, যাদের মতে (কোনো বিষয়ের নির্দেশ থাকলে, সেটির বর্ণনাও থাকতে হবে) বর্ণনার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা জায়েয নেই। (তাদের মতে শব্দের সাথে সাথে তার ব্যাখ্যাও থাকবে। সুতরাং (عام) ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটির সাথেই এমন কিছু থাকতে হবে, যা

প্রমাণ করবে যে শব্দটি এখানে (عام) ব্যাপক অর্থবোধক না হয়ে বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।)

২. অথবা ঐ (عام) ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটির ব্যাখ্যা স্থান বিশেষে প্রয়োজনের আগ পর্যন্ত বিলম্ব করে করা হয়ে থাকবে। যা অধিকাংশ আলিমের মত[103]।

আর এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে সকল স্থানে কোনো কাজ করার ওপর শাস্তির ধমকি (নিন্দা কিংবা লা'নত অথবা শাস্তির কথা) এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ঐ গুলো দ্বারা যাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছিল, তারা ঐ শব্দগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ব নির্দেশনা জানতে উন্মুখ ছিলেন। এমতাবস্থায় যদি সুদখোর ও মুহাল্লিল[104] ও অনুরূপ স্থানে যেখানে লা'নত এসেছে এবং যা হারাম হওয়ার ওপর ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোর বর্ণনায় ব্যবহৃত সেই (عام) ব্যাপক শব্দগুলোর উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু এবং মুসলিমগণ কর্তৃক সেই (عام) ব্যাপক শব্দগুলোর সর্ব দিক সম্পর্কে মত প্রকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে তো সেটার বর্ণনা যেন

---

[103] অর্থাৎ (عام) ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ (تخصيص) বা বিশেষ অর্থে ব্যবহারের বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়। কারও কারও মতে, সেটি দেরী না করে শব্দের সাথেই আসতে হবে, তবে অধিকাংশ আলেমগণের মতে, তার ওপর আমল করার সময় পর্যন্ত দেরী করে আসলেও কোনো সমস্যা নেই। [সম্পাদক]

[104] অন্যের জন্য কোনো স্ত্রী হালাল করার নিয়তে বিয়ে করা।

উম্মতের সকলে মত প্রকাশ করা পর্যন্ত দেরী করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়[105]।

তৃতীয় জবাব

এ জাতীয় বাক্য (যে সকল স্থানে কোনো কাজ করার ওপর শাস্তির ধমকি অর্থাৎ নিন্দা কিংবা লা'নত অথবা শাস্তির কথা এসেছে তা) দ্বারা উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে করে তারা এর দ্বারা হারাম চিনে নিয়ে তা থেকে বেঁচে থাকে এবং তাদের মধ্যকার ইজমা' বা ঐকমত্যের ভিত্তি হতে পারে, আর তাদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ মাসআলায় তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু শাস্তির হুমকি-ধমকি আগত হাদীসকে যদি যেখানে আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে শুধু সেখানেই কার্যকর করা হয়, তবে সেগুলোর উদ্দেশ্য জানা ইজমা' তথা ঐকমত্যের ওপর নির্ভরশীল হবে, ফলে ঐকমত্য না হওয়া পর্যন্ত তা দ্বারা দলীল পেশ করা শুদ্ধ হয় না। যার অনিবার্য ফল এটা দাঁড়ায় যে, সেগুলো আর ইজমা' (সম্মিলিত রায়) এর জন্য দলীলও হবে না। কেননা ইজমার দলীল ইজমার পূর্বে হওয়া

---

[105] কারণ, এতে করে সকল (عام) ব্যাপক শব্দের উপর আমল করা দুরূহ হয়ে পড়বে। যখনি আমল করার কথা বলবেন, বা সেখানে আগত কোনো ধমকি কার্যকর হওয়ার কথা বলবেন, তখনি হয়ত বলা হবে যে এ ব্যাপারে উম্মতের লোকদের কথা ও মত সম্পর্কে না জেনে নেওয়া হোক, তারপর কি করা যাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এ ধরণের কথা বলা হলে কোনো (عام) ব্যাপক শব্দের উপরই আমল করা যাবে না। যা কখনও বৈধ হতে পারে না; বরং যখনই কোনো (عام) শব্দ আসবে, তখনি তা মৌলিকভাবে আমলের দাবী রাখে। [সম্পাদক]

আবশ্যক, ইজমার দলীল ইজমার পরে হতে পারে না, বরং তা মানতেক শাস্ত্রে দাওর (আবর্তন) এর পর্যায়ভুক্ত হবে, যা বাতিল বা অমূলক। কারণ, তখন আহলে ইজমা‘ বা ইজমা‘ প্রণয়ণকারীগণ হাদীস দ্বারা কোনো অবস্থাতেই দলীল পেশ করতে পারবেন না যতক্ষণ না তারা জানবেন যে, উক্ত হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট মাসআলা উদ্দেশ্য। আবার ইজমা‘ তথা ঐকমত্য না হওয়া পর্যন্ত জানা যাচ্ছে না যে এটাই উদ্দেশ্য। এভাবে বলা হলে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, এ হাদীসগুলো দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে হলে তার আগে আরেকটি ইজমা সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। অথচ ইজমা‘ অনুষ্ঠিত হতে হলে তার আগে সেটার দ্বারা দলীল নিতে হয়; যখন হাদীসটি হবে সে ইজমা‘কারীদের দলীল। ফলে কোনো বস্তুর নিজের ওপর নির্ভরশীলতা বুঝায়। সুতরাং তার অস্তিত্বই অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং ভিন্নমতের স্থানে তা কখনও দলীল হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ, তা এখনও (দলীল হিসেবে) তার অস্তিত্বই নেই। আর এ জাতীয় কথা ঐ সব হাদীস (যাতে খারাপ কাজের জন্য ভীতি ও ভর্ৎসনা ইত্যাদি করা হয়েছে) এর চাহিদা অনুযায়ী ঐকমত্য কিংবা মতপার্থক্য সর্বস্থানেই সেগুলোর বিধান অকার্যকর করে দেয়।

আর এ ধরনের কথা বলা হলে, তা দ্বারা এটাও আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, কুরআন ও হাদীসের যে সকল ভাষ্যে কোনো কাজ করার ওপর কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে, সেগুলোও হারাম বলে বিবেচিত হবে না, যা অকাট্যভাবে বাতিল।

চতুর্থ জবাব

এর দ্বারা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, ঐ সমস্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যায় যে, ঐ হাদীস উক্ত অবস্থায় দলীল হিসেবে গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

ফলে প্রথম যুগের লোকদের পক্ষে এ সব হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা বৈধ হয় না; বরং যে সমস্ত সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সে সব হাদীস শ্রবণ করতেন, তারাও তাদের জন্যও তা দ্বারা দলীল পেশ করা বৈধ হয় না। আর যখন কোনো মানুষ এ ধরণের হাদীস শুনে এবং দেখতে পায় যে অনেক আলিম সেটার ওপর আমল করেছে, সেটার বিপরীতে দাঁড়ানোর মত কোনো কিছু জানা না থাকে, তারপরও সেটার ওপর আমল করা তার জন্য অবশ্যম্ভাবী হবে না, যতক্ষণ না খুঁজে দেখবে যে, পৃথিবীর প্রান্তদেশে কেউ এর বিরোধিতা করেছে কি না? যেমনিভাবে ইজমা'র মাসআলাতেও যতক্ষণ পূর্ণরূপে খুঁজে না দেখবে ততক্ষণ সেটা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না!

আর যদি উপরোক্ত বিষয়গুলো সঠিক বলে মনে করা হয়, তাহলে তো কোনো একজন মুজতাহিদের পক্ষ থেকে ভিন্নমত পাওয়া গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা সে বিষয়ে দলীল গ্রহণ করা বাতিল হয়ে যাবে। এর ফলে কোনো এক ব্যক্তির কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে বাতিলকারী হয়ে যাবে, আর তার কথার অনুযায়ী হওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা সত্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

আর সে হিসেবে যদি কোনো একজন ভুল করে, তবে তার ভুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে বাতিলকারী হয়ে যাবে, এ সবই তো নিঃসন্দেহে বাতিল।

কেননা যদি বলা হয়, “ইজমা” সংঘটিত হবার জ্ঞানা না হলে হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না, তা হলে তো হাদীসের চাহিদা ও বিধান বাস্তবায়ণ ‘ইজমা’-এর ওপর নির্ভরশীল বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ মনে করা ইজমা’র পরিপন্থী। এমতাবস্থায় হাদীসের কোনো ভাষ্যেরই আর চাহিদা থাকবে না। কেননা সেটা অনুসারে শুধু ‘ইজমা’ই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়, হাদীসের কোনো প্রভাবই থাকে না।

অতঃপর যদি বলা হয়, সে হাদীস দ্বারা তখনই দলীল নেওয়া যাবে, যখন তার চাহিদার বিপরীত কোনো মত অবগত না হওয়া যায়। তখন বলা হবে যে, এতে করে তো উম্মতের এক ব্যক্তির কথা হাদীসের চাহিদা ও বিধানকে বাতিলকারী হয়ে যাবে।

এরূপ কথাও ‘ইজমার’ পরিপন্থী। এটা যে দীনে ইসলামে বাতিল মত তা অবশ্যম্ভাবীভাবে পরিজ্ঞাত।

পঞ্চম জবাব

হয়ত এই সম্বোধনটি (অর্থাৎ কোনো কাজের নিষেধ করে আসা হুমকি-ধমকির নির্দেশনাটির) ব্যাপকতার দলীল হওয়ার জন্য সে বিষয়ে সমস্ত উম্মতের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা শর্ত অথবা কেবল আলিমগণের দৃঢ় বিশ্বাস থাকাই যথেষ্ট।

প্রথম অবস্থায় শাস্তি সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা কোনো বস্তুর হারাম হওয়ার দলীল গ্রহণ করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত উম্মত তার হারাম বা অবৈধতায় দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ না করে। এমনকি যারা মরুভূমির বেদুইন ও নবদীক্ষিত মুসলিম, তাদের মতৈক্যেরও প্রয়োজন রয়েছে।

এটা কোনো মুসলিম কেন, কোনো বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেও সঠিক বলে বিবেচনা করবে না। কেননা এরূপ শর্তের ইলম সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আর যদি বলা হয় যে, কোন বিষয়ের দলীল হওয়ার জন্য সমস্ত আলিমের ই'তিকাদ বা দৃঢ় ধারণাই যথেষ্ট, তা হলে জবাবে বলা হবে- এভাবে তো তুমি আলিমগণের ইজমার শর্তই আরোপ করলে, যাতে করে কোনো মুজতাহিদ ইজতেহাদে ভুল করার ফলে সে শাস্তির হুমকি-ধমকির সম্মুখীন হতে না হয়। আর এই হুকুম তো পুরোপুরিভাবে ঐ সাধারণ লোকের ব্যাপারেও প্রযোজ্য যে হারামের দলীল সম্পর্কে অবহিত নয়। কেননা লা'নতে পতিত হবার আশংকা যেভাবে মুজতাহিদের জন্য রয়েছে অনুরূপভাবে সাধারণ লোকটির ক্ষেত্রেও সে আশংকা বিদ্যমান।

মুজতাহিদগণ এর (লা'নতে পতিত হওয়ার) আবশ্যকতা থেকে এটা বলে রক্ষা পাবেন না যে, তারা উম্মতের আলিম, নেককার ও সম্মানিত সত্যবাদী লোক, আর অপরপক্ষ হচ্ছে উম্মতের অখ্যাত ও সাধারণ লোক। কেননা উভয় উম্মতের মধ্যে এইরূপ পার্থক্যের দরুনও এই মাসআলার হুকুম বিভিন্ন হবে না, বরং উভয়ই সমান। কারণ, আল্লাহ মুজতাহিদের ভুল যেভাবে ক্ষমা করেন, অনুরূপভাবে এমন অজ্ঞ

লোকের ভুল-ভ্রান্তিও ক্ষমা করেন, যার পক্ষে বিদ্যা শিক্ষা সম্ভব হয় নি। বরং সাধারণ জাহেল ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত: হারামে লিপ্ত হলে যে ফাসাদের সৃষ্টি হয়, কোনো ইমাম শরী'আতে হারামকৃত বস্তুকে হালাল ঘোষণা করলে তার চেয়ে অধিকতর ফাসাদের সৃষ্টি হয়, যদিও সেই ইমাম ঐ বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত নয় এবং তার পক্ষে হারাম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াও সম্ভব হয় নি।

এ জন্য বলা হয়ে থাকে:

احذروا زلة العالم، فإنه إذا زل زل بزلته عالَم.

“তোমরা আলিমের পদস্খলনকে ভয় কর। কেননা যখন কোনো আলিমের পদস্খলন ঘটে তখন সারা দুনিয়ার পদস্খলন ঘটে।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন:

«ويلٌ للعالم من الأتباع»

“কখনও কখনও আলিমের অনুসারীগণ তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।”

যদি তাদের (আলিমগণের) এ কাজ ক্ষমার যোগ্য হয়, যদিও তাতে তার কর্মকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট অনাসৃষ্টি ভীষণ ভয়াবহ, তাহলে অন্যদের (সাধারণ লোকদের) থেকে, যাতে সে রকম ভয়াবহ সমস্যা হয় না, তাদের কাজ ক্ষমার যোগ্য হওয়াটাই আরও স্বাভাবিক।

হ্যাঁ, তাদের (মুজতাহিদ ও সাধারণ লোকের) মধ্যে অন্য দিকে একটি পার্থক্য করা যায়, তা হচ্ছে, এ লোক (মুজতাহিদ) তো ইজতিহাদ বা গবেষণা করে কথা বলেছেন। আর তার দ্বারা ইলম প্রচার ও সুন্নাতের প্রসারে ও পুনরুজ্জীবনের যে উপকারিতা হাসিল হয় সেটার বিপরীতে সে ফাসাদ কিছুই নয়। তাছাড়া মহান আল্লাহও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি মুজতাহিদকে তার ইজতেহাদের জন্য এমন সাওয়াব দান করেন ও আলিমকে তার ইলমের জন্য এমন প্রতিদান প্রদান করেন, যার মধ্যে জাহেল বা অজ্ঞ ব্যক্তি শরিক নয়। অতএব, তারা উভয়ই ক্ষমার দিক দিয়ে সমান। কিন্তু সাওয়াবের দিক দিয়ে পরস্পর বিপরীত। আর নিরপরাধ ব্যক্তির ওপর শাস্তি বর্তানো সার্বিকভাবে নিষিদ্ধ। চাই সে অপরাধ বড় হোক কিংবা ছোট হোক।

সুতরাং হাদীস হতে এ নিষিদ্ধ বিষয় (শাস্তি বর্তানো) এমনভাবে দূর করতে হবে যেন উভয় পক্ষকে শামিল করা যায়।

ষষ্ঠ জবাব

কখনও কখনও শাস্তির ধমক আগত হাদীসগুলো, মতভেদের স্থানে সরাসরি প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যেমন, لعنة المحلّل له বা “হিলা বিবাহের মাধ্যমে যার জন্য হালাল করা হয়েছে, তার ওপর লা‘নত (অভিশাপ)” এর বিষয়টি। আলিমগণের কেউ কেউ বলেন, কোনো অবস্থাতেই সে গুনাহগার হবে না। কেননা সে কোনো অবস্থাতেই প্রথম আকদ এর জন্য মূল অঙ্গ নয়, যাতে বলা হবে যে ‘তাকে লা‘নত করা হয়েছে’। কেননা সে বিশ্বাস করছে যে, হিলা করার মাধ্যমে সে

(লোকটি, যে হিলা বিয়ে করে তার জন্য স্ত্রীকে হালাল করেছে, সে তার সাথে কৃত) ওয়াজিব অঙ্গীকারই পালন করছে।

সুতরাং যার বিশ্বাস এটা যে, প্রথম বিবাহ ঠিক, যদিও শর্তটি বাতিল, সে মনে করে যে এর মাধ্যমে দ্বিতীয়জনের জন্য মহিলাটি হালাল হবে, আর এতে করে দ্বিতীয়জনও (যার জন্য হালাল করা হয়েছে) গুণাহমুক্ত হবে।

বরং এভাবে المحلّل বা হিলা বিবাহকারীও। সে হয়ত হিলা করণের কারণে লা'নতপ্রাপ্ত হবে অথবা কেবল বিবাহ বন্ধনের সাথে সম্পৃক্ত শর্ত পূর্ণ করা ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করার কারণে লা'নত প্রাপ্ত হবে অথবা উভয় কারণেই লা'নতে পড়বে।

যদি প্রথম ও তৃতীয় কারণে হয়, তা হলে উদ্দেশ্য হাসিল হবে[106]।

আর যদি দ্বিতীয়টি হয়, তবে এরূপ বিশ্বাসই তাকে অবশ্যম্ভাবীভাবে লা'নতের মুখোমুখি করেছে। এমতাবস্থায়, হিলা হাসিল হোক বা না হোক উভয় ক্ষেত্রই সমান।

---

106 অর্থাৎ সে মৌলিকভাবে লা'নতের সম্মুখীন হবে। যদিও কোনো প্রতিবন্ধক কিংবা শর্ত না পাওয়া জনিত কারণে সেটা বাস্তবায়ণ নাও হতে পারে। [সম্পাদক]

এই অবস্থায় হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে, তা লা'নতের কারণ বলেই বিবেচিত হয় না, কিন্তু এটি সম্পূর্ণভাবে বাতিল কথা[107]।

অতঃপর হিলা বিবাহকারী, যে ব্যক্তি শর্ত পূরণ করা ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করছে, যদি সে জাহেল বা অজ্ঞ হয়, তবে তার ওপর অভিশাপ প্রযোজ্য হবে না। আর যদি ঐ ব্যক্তি জানে যে এটা পূর্ণ করতে সে বাধ্য নয়, তাহলে তার পক্ষে সেটা ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করাই অসম্ভব বাপার। তবে হ্যাঁ, যদি সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা পোষণ ও বাহানা করার ইচ্ছা করলে সেটা ভিন্ন কথা, কারণ সে তখন কাফির হয়ে যাবে।

তখন হাদীসের অর্থ দাড়াবে, কাফিরদের প্রতি লা'নত করা। আর এটা জানা কথা যে, এই আংশিক হুকুম অস্বীকারের কারণে যে কুফুরী হবে তার সাথে লা'নতকে বিশেষায়িত করার কোনো অর্থ হয় না[108]। বরং এ হিসেবে সে যেন বলল, 'ঐ ব্যক্তির ওপর আল্লাহর অভিশাপ, যে

---

[107] কারণ, হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে, হিলা বিবাহ করা। সেটাই মূলতঃ লা'নতে পড়ার কারণ। কিন্তু যদি দ্বিতীয় অবস্থা ধরা হয়, তখন হাদীসে উল্লেখিত লা'নতের কারণটি আর কারণ থাকে না। যা অবশ্যম্ভাবী ভাবে বাতিল বলে স্বীকৃত হবে। [সম্পাদক]

[108] কারণ, 'কাফিরকে হিলা বিয়ে সংক্রান্ত রাসূলের বিরোধিতার কারণে কাফির বলা' কাফিরদের কুফুরীকে সীমিত করার মত। কারণ, সে তো শরী'আতের অন্যান্য বিধানকেও অস্বীকার করে থাকে। সুতরাং ব্যাপক বিধানকে কোনো ছোট অংশের ওপর নিয়ে সীমাবদ্ধ করা কোনো ক্রমেই সঠিক নয়। [সম্পাদক]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া বিধান ‘বিবাহে তালাকের শর্ত করা বাতিল’ এ হুকুমে মিথ্যারোপ করে।

তারপরও আরও লক্ষণীয় যে, হাদীসে ব্যবহৃত বাক্য সাধারণ ও ব্যাপক, শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই, যা ব্যাপকতা দিয়েই শুরু হয়েছে।

এ ধরণের ব্যাপকতাকে কদাচিৎ বা বিরল অর্থ বুঝানো কখনও বৈধ নয়। কারণ, তখন পুরো বাক্যটিই দুর্বোধ্য ও আড়ষ্টবাক হিসেবে বিবেচিত হবে[109]। যেমন কোনো কোনো ব্যাখ্যাদাতা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»

“যে স্ত্রীলোক তার অলি বা অভিভাবকদের হুকুম ছাড়া বিয়ে করে, তার বিয়ে বাতিল”[110]। এ হাদীসটিকে ‘মুকাতাবাহ’ তথা ‘অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের শর্তাধীন ক্রীতদাসী’র সাথে সম্পৃক্ত (বিরল) বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা[111]।

[109] অথচ কুরআন ও সুন্নাহর কোনো বাক্য এ ধরণের নয়। সুতরাং কোনো সার্বিকভাবে ব্যাপক নির্দেশকে বিরল অর্থে ব্যবহার করার যৌক্তিকতা নেই। [সম্পাদক]

[110] মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ।

[111] সেটা অনুসারে তাদের নিকট, যে কোনো মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করতে পারবে, তবে কেবল ‘মুকাতাবাহ’ বা ‘অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের শর্তাধীন ক্রীতদাসী’ তা করতে পারবে না। সন্দেহ নেই যে, এভাবে হাদীসকে একটি বিরল প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ করা হয়ে যায়, যা হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য নয়। [সম্পাদক]

আর এ অর্থ বিরল বা কদাচিৎ হওয়ার বর্ণনা এই যে, যে মুসলিম ঐ হাদীসের অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ, সে হাদীসের বিধানের আওতা বহির্ভুত। কিন্তু যে শিক্ষিত মুসলিম জানে যে ঐ শর্ত পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়, আর সে এ শর্তটি পূরণ করা ওয়াজিব বলেও বিশ্বাস করে না। যদি না সে কাফের হয়, (তবে সেই তা বিশ্বাস করতে পারে।) আর কোনো কাফির মুসলিমদের মত বিবাহ করে না; কিন্তু যদি সে মুনাফিক হয় (তবে সেই এ ধরণের কাজ করতে পারে)। সুতরাং এ ধরণের বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া নিঃসন্দেহে বিরল ও কদাচিৎ।

এমনকি যদি বলা হয় যে, এরূপ (কদাচিৎ বা বিরল) বিয়ের বিষয়টি কথকের স্মৃতিপটে উদিতই হয় না, তবে সে বক্তার বক্তব্য সত্য হিসেবে ধর্তব্য হবে।

আর আমরা অন্যস্থানে[112] এর বহু প্রমাণাদি উল্লেখ করেছি যে, এ হাদীস দ্বারা ঐ ব্যক্তিই উদ্দেশ্য, যে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের স্ত্রী হালাল করার জন্য বিয়ে করে, যদিও বিয়ের সময় ঐ শর্তের উল্লেখ না থাকে।

শাস্তির হুমকি-ধমকি সংক্রান্ত ব্যাপক (عام) হাদীসের অনুরূপ বিশেষ (خاص) হাদীসেরও একই ধরণের বিধান:

[112] যে গ্রন্থটির দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন সেটি হচ্ছে, إقامة الدليل على إبطال التحليل যা শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার ‘মাজমু‘ ফাতাওয়া’ এর তৃতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত হয়েছে।

অনুরূপভাবে[113] লা'নত ও জাহান্নামের শাস্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিশেষ হুমকি-ধমকি সম্বলিত দলীলসমূহও বিভিন্ন স্থানে এসেছে, যদিও তাতে আমলের ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

যেমন, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» «وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ»

"বেশি বেশি কবর যিয়ারতকারিণী মহিলা, কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণকারী এবং কবরের ওপর বাতি প্রজ্জলনকারীদের ওপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ"। ইমাম তিরমিযী এটাকে 'হাসান' হাদীস বলেছেন।[114]

---

[113] অর্থাৎ উপরোক্ত আলোচনাটি ছিল শাস্তির হুমকি-ধমকি সংক্রান্ত সাধারণ তথা ব্যাপক (عام) নির্দেশনা সংক্রান্ত। সেখানে মতভেদ থাকলেও শাস্তির ধমকি সংক্রান্ত বিধান কার্যকর হওয়ার বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে যেখানে শাস্তির হুমকি-ধমকির বিষয়ে (خاص) বিশেষ নির্দেশনা এসেছে সেখানেও মতভেদ থাকার কারণে তা কার্যকর হবে, যদিও অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে বা কোনো শর্তের অনুপস্থিত থাকার কারণে সেটা সুনির্দিষ্ট কারও ব্যাপারে কার্যকর হতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

[114] শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহেমাহুল্লাহ যেভাবে বলেছেন, মূলত তিরমিযীতে হাদীসটি এভাবে নয়। তিরমিযীতে হাদীসটির শব্দ হচ্ছে,

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ القُبُورِ، وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ»

যার অর্থ হচ্ছে, "মেয়েদের মধ্যে যারা কবর যিয়ারত করে এবং আর অন্যান্য যারাই কবরগুলোকে মসজিদ বানায় ও তাতে বাতি লাগায় তাদের সবাইকে রাসূলুল্লাহ্

অথচ মেয়েদের জন্য কবর যিয়ারতকে কেউ অনুমতি দিয়েছেন, আবার কেউ মাকরূহ বলেছেন, হারাম বলেন নি।

অনুরূপভাবে উক্ববাহ ইবন আমের রাদিয়াল্লাহুর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি “সে সকল লোকদের লা‘নত করেছেন, যারা স্ত্রীলোকের পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করে”[115]।

তদ্রূপ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসও তার উদাহরণ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»

“যে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য বাজারে নিয়ে যায়, আল্লাহ কর্তৃক সে রুজিপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মালামাল বাজারজাত না করে মওজুদ করে রেখে দেয়, সে অভিশপ্ত।[116]”

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা‘নত করেছেন”। যা সনদের দিক থেকে শাইখুল আলবানীর নিকটি দুর্বল বর্ণনা। তবে শাইখ ওপরে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তার প্রথম অংশ কেবল মুসনাদে তায়ালাসীতেই এসেছে। অন্য অংশ সহ সেটি বাইহাকীতে এসেছে। প্রথম অংশের অপর শব্দ হচ্ছে,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা‘নত করেছেন বেশি বেশি কবর যিয়ারতকারীনী মহিলাদেরকে”।

মোটকথা, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ উল্লিখিত হাদীসের প্রথম অংশের সনদ হাসান। দ্বিতীয় অংশের সনদ দুর্বল।

[115] মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ।

[116] সহীহ মুসলিম, ইবন মাজাহ।

তাছাড়া অন্য তিন ব্যক্তি সংক্রান্ত হাদীস, যাদের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের সাথে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না ও তাদেরকে গুনাহ হতে পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি হলো, যে অতিরিক্ত পানি প্রদান হতে মানুষকে নিষেধ করে।

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরাব বিক্রেতাকে অভিশাপ দিয়েছেন। অবশ্য পূর্ববর্তীগণের কেউ কেউ শরাব (মদ) (কাফেরদের কাছে) বিক্রি করেছেন।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন পন্থায় সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি অহঙ্কারপূর্বক পায়ের গিরার নিচে কাপড় পরিধান করে, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামত দিবসে তার প্রতি তাকাবেন না[117]।”

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, “তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, বরং তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে। তারা হলো, যে গিরার নিচে কাপড় পরিধান করে, দানের বিনিময়ে বদলা আশা করে (বা খোটা দেয়) এবং মিথ্যা শপথ করে নিজস্ব দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করে[118]।” এতদসত্ত্বেও, কতিপয়

---

[117] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ।

[118] সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ।

আলিম ও ফকীহ্ অহংকার করে গিরার নীচে কাপড় পরিধান করাকে মাকরূহ মনে করেন, হারাম বলেন না।

তদ্রূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন: "পরচুলা পরিহিতা স্ত্রীলোক এবং পরচুলা তৈরিকারী স্ত্রী লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলার লা'নত বা অভিশাপ"[119]। এটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। এতদসত্ত্বেও পরচুলা গ্রহণের ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্‌র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "যে ব্যক্তি, রুপার পাত্রে পান করে, তার পেটে জাহান্নামের অগ্নি প্রবেশ করবে"[120] অথচ কতিপয় আলিম এ কাজকে হারাম বলেন নি[121]।

সপ্তম জবাব

---

[119] আহমদ, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

[120] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

[121] অর্থাৎ উপরোক্ত মাসআলাগুলো খাস বা নির্দিষ্ট লোকদেরকে লা'নত করা হয়েছে। আবার ব্যাপক লোকদেরকেও লা'নত করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও কোনো কোনো আলেম তা হারাম বলেন নি। সেটাতে তাদের হয়ত কোনো ওযর আছে। কিন্তু কাজগুলো আসলে হারাম এবং এর কারণে অন্যান্যদের বেলায় শাস্তির বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে সে সব আলিম বিভিন্ন কারণে শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। মতপার্থক্য আছে বলেই সেটা হারাম হবে না বা সেগুলোতে উল্লেখিত শাস্তি প্রযোজ্য হবে না, এমনটি বলা যাবে না। তাই মতপার্থক্য হলেও হাদীস বিশুদ্ধ হলে (খবরে ওয়াহেদ হলেও) সেখানে যে শাস্তির কথা রয়েছে যে এ ধরনের কাজ করবে তাকে সে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। (যদি না তা বাস্তবায়নে কোনো প্রতিবন্ধক আসে, বা কোনো শর্ত পূর্ণতা না পায়)। [সম্পাদক]

সপ্তম জবাব এই যে, (ঐ সকল হাদীসে বর্ণিত শব্দগুলোর চাহিদা) (عموم) বা ব্যাপক হওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত বিষয়। পক্ষান্তরে সেটার চাহিদার বিপরীত যে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে বিপরীতে দাঁড়ানোর যোগ্যই নয়। কেননা সে যুক্তির শেষ কথা হচ্ছে এই যে, এতে সাধারণ অবস্থায় মতৈক্য ও মতানৈক্য উভয় অবস্থাতে এমন কিছু লোকও লা'নতের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা প্রকৃত লা'নতের যোগ্য নয়।

তার উত্তরে বলা হবে, যেভাবে ব্যাপককে নির্দিষ্ট করা মূল নিয়মের বিপরীত কাজ, তেমনিভাবে সেটাতে অতিরিক্ত করাও মৌলিক নিয়মের পরিপন্থী কাজ। অতএব, হাদীসে বর্ণিত সাধারণ হুকুম হতে ঐ সব লোক বাদ পড়বে, যারা অজ্ঞতা, ইজতিহাদ ও তাকলিদ বা অনুকরণের কারণে অপারগ ও অক্ষম। যদিও ঐ ব্যাপক হুকুম যারা অক্ষম নয় তাদেরকে এমনভাবে শামিল করে যেমন মতৈক্যের স্থানের সবাইকে শামিল করে। কারণ এ ধরণের নির্দিষ্টকরণ অত্যন্ত কম। সুতরাং এটাই উত্তম।

অষ্টম জবাব

অষ্টম জবাব এই যে, ব্যাপক শব্দটিকে যখন আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে যারা সে কাজ করবে তাদের সবাইকে তা শামিল করলে, হাদীসের মধ্যেই সে লা'নত বা অভিশাপের কারণ উল্লেখ হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। আর তখন যাদেরকে তা থেকে ব্যতিক্রম ধরা হবে তাদের ব্যাপারে বলা হবে যে, প্রতিবন্ধকতার কারণে তাদের ওপর সেটা

প্রযোজ্য হয় নি। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি ওয়াদা দেয় অথবা ভীতি প্রদর্শন করে, সে ওয়াদা কিংবা ভীতিপ্রদর্শন কারও জন্য কোনো কারণে বাদ পড়ে গেলে, সেটাকে ব্যতিক্রম বলে নেওয়া জরুরী নয়। ফলে বাক্য তার সঠিক পদ্ধতিতে চলমান থাকবে।

কিন্তু যখন আমরা লা'নত বা অভিশাপ এমন কাজের নিমিত্তে করব যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথবা লা'নতের কারণ ইজমা' বিরোধী বিশ্বাস পোষণকে ধরব, তখন তা থেকে বুঝা যাবে যে হাদীসে লা'নতের কারণ বর্ণিত হয় নি। অবশ্য এসব ব্যাপক শব্দ বিশিষ্ট হাদীসগলোকে কোনো না কোনোভাবে নির্দিষ্টকরণ করতেই হয়।

সুতরাং যদি উভয় দিক থেকেই সে সব হাদীসের ব্যাপকাতে নিদিষ্টকরণ করতেই হচ্ছে, তাহলে প্রথম অবস্থাতেই তা কার্যকর করা শ্রেয়। কারণ তা বাক্যের রীতি অনুযায়ী হয়, আর তাতে কিছু উহ্য রাখার প্রয়োজন হয় না।

নবম জবাব

নবম জবাব এই যে, যে কারণে এসব হাদীসে উল্লিখিত ভীতিপ্রদর্শনকে ব্যাপকতা দেওয়া হচ্ছে না তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওযর রয়েছে এমন ব্যক্তিকে লা'নতের সম্মুখীন না করা। ইতোপূর্বে আমরা বলেছি যে, শাস্তির ধমকি আসা হাদীসগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা বর্ণনা করা যে, এসব কাজ লা'নতের কারণ। অর্থাৎ এ কাজ লা'নতের কারণ।

সুতরাং যদি তা বলা হয়, তাহলে এর দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই সে হুকুম প্রযোজ্য হওয়া অপরিহার্য হয় না। হ্যাঁ, এর দ্বারা আবশ্যক হয় যে, (কোনো কারণে) হুকুম(টি) প্রযোজ্য না হলেও এতে হুকুমের কারণটি অবশ্যই রয়েছে। আর এটা থাকাতে কোনো দোষের কিছু নেই।

আর ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, মুজতাহিদ ভর্ৎসনা বা লাঞ্ছনার সম্মুখীন হবে না। এমনকি আমরা এটাও বলি যে, হারামকে হালালকারী ব্যক্তি সেটার ওপর আমলকারীর (যিনি হারামকে হালাল বলে মনে করেন নি তার) চেয়ে অধিকতর বড় অপরাধী, তারপরেও অপারগ ও অক্ষম ব্যক্তিকে আমরা অক্ষম হিসেবে দেখব। (অর্থাৎ মুজতাহিদ যদি সঠিক রায় দিতে না পারে, তবে আমরা তাকে অক্ষম বা অপারগই বলব। সুতরাং তিনি শাস্তির সম্মুখীন হবেন না।)

যদি প্রশ্ন করা হয়, এমতাবস্থায় শাস্তি কার হবে?

যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে কে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে? কারণ, প্রকৃত হারাম কাজটির আমলকারী, মুজতাহিদ, (Assiduous) হবে অথবা মুকাল্লিদ (Imitator) ব্যক্তি হবে। আর উভয়েই শাস্তির আওতার বাইরে।

আমরা বলব, এর জবাব কয়েকটি উপায়ে দেওয়া যেতে পারে:

১. আমাদের উদ্দেশ্য এটা বর্ণনা করা যে, এই কাজটি ঐ শাস্তির উপযুক্ত। তার আমলকারী পাওয়া যাক বা না যাক।

যদি এটা ধরে নেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তিই এ কাজে লিপ্ত হবে, তার মধ্যে শাস্তির শর্তের অনুপস্থিতি থাকবে অথবা শাস্তি প্রযোজ্য হওয়ার

ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দিবে। এতদসত্ত্বেও, ঐ কাজটি নি:সন্দেহে হারাম হতে বাধা হয়ে দাড়ায় না। বরং আমরা জানি যে এটা হারাম কাজ, যাতে করে যার কাছে তা হারাম বলে স্পষ্ট হবে সে তা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

আর যারা দ্বারা এ কাজটি অনুষ্ঠিত হবে, তার জন্য আল্লাহর রহমত এই হবে যে, তার পক্ষে কোনো একটি ওযর থাকবে। (যাতে করে সে শাস্তির সম্মুখীন হওয়া থেকে বেঁচে যায়।) এর উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সগীরা গুনাহও হারাম। কিন্তু যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকবে, আল্লাহ তার সগীরা গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। (কারণ, আল্লাহ তা'আলা অসীম ক্ষমাশীল এটা তার রহমতের বহিঃপ্রকাশ)। এই অবস্থা সকল প্রকার মতভেদপূর্ণ হারাম কাজের বেলায় প্রযোজ্য।

সুতরাং যখন কাজটি হারাম হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে, যদিও কোনো ব্যক্তি ইজতিহাদ কিংবা তাকলিদ করে সে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, আর তার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে, তবুও তা আমাদেরকে ঐ কাজটি হারাম বলে বিশ্বাস করতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

২. কোনো বিষয়ে শরী'আতী হুকুম বর্ণনা করার উদ্দেশ্য শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার পথে যাবতীয় সন্দেহ যা প্রতিবন্ধক হিসেবে আসতে পারে তা দূর করা। কেননা কোনো বিশ্বাসের কারণে সে কাজ করাকে যদিও ওযর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়, তবুও সে ওযর সবসময় ওযর হিসেবে বলবৎ থাকবে এটা কখনও উদ্দেশ্য নয়, বরং সে ওযর যথাসম্ভব অবসানই উদ্দেশ্য। যদি তা না হত, তা হলে ইলম এর বর্ণনা ওয়াজিব

করা হত না। আর মানুষকে অজ্ঞতার মধ্যে ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয় হত ও সন্দেহযুক্ত মাসআলার দলীলের বর্ণনা না করাই ভাল হত[122]।

৩. হুকুম ও শাস্তি বর্ণনা করা সে কাজটি পরিত্যাগকারীর জন্য পরিত্যাগের ওপর দৃঢ় থাকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তা না হলে উক্ত হারাম কাজের আমল ছড়িয়ে পড়ত।

৪. এই ওযর কারও বেলায় গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এটা দূরীকরণে অসমর্থ হলে, তার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা যখন মানুষের পক্ষে সত্যানুসন্ধান সম্ভব হয়, অতঃপর সে এত ইচ্ছাকৃত শিথিলতা করে, তাহলে অপারগ হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

৫. কখনও কখনও কাজটি কোনো লোক এমন ইজতিহাদের ওপর ভিত্তি না করেই করে বসল; যে ইজতিহাদ তা বৈধ করত অথবা এমন তাকলীদের ওপর ভিত্তি না করেই করে বসল, যে তাকলীদ তার জন্য তা জায়েয করত। ফলে এ শ্রেণির লোকের ক্ষেত্রে এ বিশেষ প্রতিবন্ধকতা (অর্থাৎ ইজতিহাদ কিংবা তাকলীদ) না থাকা শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে সে শাস্তির সম্মুখীন হবে এবং শাস্তি তাকে পেয়ে বসবে। যদি না অন্য কোনো

---

[122] অথচ তা সবার নিকটই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং কোনো হারাম কাজ ইজতিহাদ কিংবা তাকলীদের কারণে করা ওযর হিসেবে ধর্তব্য হলেও তা সাময়িক ব্যাপার। তারপর যখনই হক স্পষ্ট হবে, জ্ঞান আসবে, দলীল পাওয়া যাবে, তখনই তাকে দলীলের দিকে ফিরে আসতে হবে। [সম্পাদক]

প্রতিবন্ধকতা যেমন, তাওবা বা পাপমোছনকারী নেক কাজ ইত্যাদি তার জন্য বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

তাছাড়া বিষয়টি দ্বিধান্বিত বিষয়। কখনও কখনও মানুষ মনে করতে পারে যে, তার ইজতিহাদ অথবা তাকলীদের ফলে ঐ কাজটি তার জন্য বৈধ হবে, এমতাবস্থায় তার এ ধারণাটি যেমন কখনও কখনও সঠিক হতে পারে, তেমনি আবার তা কখনও কখনও ভুলও হতে পারে। কিন্তু এও উল্লেখযোগ্য যে, যখন কোনো ব্যক্তি সত্যানুসন্ধানী হয় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ তাকে সত্যানুসন্ধান থেকে বাধা না দেয়, তখন আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না। (অর্থাৎ এর পর ভুল করলেও সে ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য শাস্তির সম্মুখীন হবে না।)

দশম জবাব[123]

যদি এসব হাদীস (শাস্তির ধমকি এসেছে এমন হাদীসসমূহ) তার চাহিদার ওপর বর্তমান থাকে, (অর্থাৎ মতভেদ রয়েছে এমন জায়গায় কার্যকর থাকে) আর এর ফলস্বরূপ কোনো কোনো মুজতাহিদ শাস্তির

---

[123] এটি তাদের আপত্তির দশম উত্তর, যারা শাস্তির নির্দেশ বাস্তবায়ণের ব্যাপারে আপত্তি তুলে বলেছিল যে, শাস্তির হাদীসসমূহ শুধু সেখানেই প্রযোজ্য হবে যেখানে সেটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে, যেখানে কোনো প্রকার দ্বিমত পাওয়া যাবে সেখানে সেটার শাস্তি বর্তাবে না, বা সে হাদীসের শাস্তি আপতিত হবে না।

বস্তুতঃ তাদের এ কথাটি সঠিক নয়, বরং হাদীস শুদ্ধ হলে তার দাবী সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। শাইখুল ইসলাম পূর্বে তাদের কথা খণ্ডানোর জন্য নয়টি জওয়াব দিয়েছেন এখানে দশম জওয়াব দিচ্ছেন। [সম্পাদক]

ধমকির অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়; তবে এরূপভাবে হাদীসগুলো তার চাহিদা হতে বের করলেও কোনো কোনো মুজতাহিদকে শাস্তির ধমকির অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী হয়ে পড়ে।

আর যখন উভয় অবস্থাতেই শাস্তির ধমকি আসা জরুরী হয়ে পড়ে, তখন হাদীসটি কোনো প্রকার বিরোধিতা থেকে নিরাপদই থেকে গেল। সুতরাং তার ওপর (সর্বস্থানে) আমল করা ওয়াজিব।

এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, বহু ইমাম পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মতবিরোধ রয়েছে এমন মাসআলার আমলকারী ব্যক্তি অভিশপ্ত। আবদুল্লাহ্ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এ মত পোষণ করেছেন। তার নিকট প্রশ্ন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে করা হলো, যে হালাল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে, অথচ মহিলাটি ও তার স্বামী এই সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। তখন তিনি বললেন: "এটা ব্যভিচার, বিয়ে নয়। আল্লাহ হালালকারী ব্যক্তি ও যার জন্য হালাল করা হয়, উভয়কেই অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন"। এ বর্ণনাটি ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিভিন্নভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তা অন্যান্যদের থেকেও এসেছে, তাদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ অন্যতম। তিনি বলেন: "যখন কোনো ব্যক্তি পূর্ণ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করতে চায়, সেই হলো বা হালালকারী। আর ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত।" আর এ কথাই বহু সংখ্যক ইমাম হতে বহু মাসআলা যেমন, মদ ও সুদ ইত্যাদি বহু মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।

এখন যদি বলা হয় যে, শরী‘আতের লা‘নত সম্বলিত শাস্তির ধমকি আসার হাদীসগুলো শুধু তখনই প্রযোজ্য হবে যেখানে মাসআলাটির ব্যাপারে কোনো প্রকার মতভেদ পাওয়া যাবে না, তাহলে তো এ সব মনীষী এমন লোকদের লা‘নত করলেন যাদের লা‘নত করা জায়েয হয় না, যার ফলে তাদের ওপর সে সব হাদীসের শাস্তি আপতিত হওয়া আবশ্যক হয়, যেখানে যারা লা‘নতের উপযুক্ত নয় তাদের লা‘নত করার ব্যাপারে ধমকি এসেছে। যেমন,

- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোন মুসলিমকে লা‘নত বা অভিশাপ দেওয়া তাকে হত্যা করার মতই”। (বুখারী, মুসলিম)।
- অনুরূপভাবে ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোনো মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী ও তার সাথে যুদ্ধবিগ্রহ করা কুফুরী”।[124]
- আবুদারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছেন: “লা‘নতকারী ও অভিশাপদাতা কিয়ামত দিবসে সুপারিশকারীও হবে না এবং অন্য উম্মতের ওপর সাক্ষ্যদানকারীও হতে পারবে না”। (মুসলিম)।

---

[124] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

- অন্যত্র আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোনো সিদ্দীক বা সত্যবাদীর জন্য অভিশাপকারী হওয়া উচিৎ নয়"।[125]
- অন্যত্র আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন: "মুমিন ব্যক্তি ভর্ৎসনাকারী, অভিশাপদাতা, কটুবাক্যকারী এবং বদমেজাজী হতে পারে না"। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন ও হাসান হাদীস বলেছেন।
- অন্য আছার বা হাদীসে মওকুফে (যে হাদীসের সনদের সিলসিলা সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছে, সেখানে) আছে, (যখন কোনো ব্যক্তি কাউকে লা'নত করে বা অভিশাপ দেয়, আর প্রকৃত পক্ষে ঐ ভ্যক্তি যদি অভিশাপের পাত্র না হয়, তখন ঐ অভিশাপ অভিশাপকারীর ওপর বর্তাবে"।[126]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এরূপ লা'নতের ব্যাপারে এত এত মারাত্মক শাস্তির ধমকি এসেছে। এমনকি বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে লা'নত দেয়, অথচ ঐ ব্যক্তি লা'নতের উপযোগী নয়, তা হলে সেই অভিশাপকারীই অভিশপ্ত হবে; আর লা'নতের কাজটি ফাসেকী; তা মানুষকে ছিদ্দিকীন, সুপারিশকারী ও স্বাক্ষীদানের মর্যাদা হতে বের

[125] সহীহ মুসলিম।

[126] তিরমিযী, আবু দাউদ।

করে দেয়। আর এটি তাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যে লা'নতের অনুপযোগী ব্যক্তিকে লা'নত করে।

অতএব, যদি মতভেদপূর্ণ মাসআলায় কেউ সে কাজটি করল, আর সে ব্যক্তিকে (মতভেদ পাওয়া গেছে এ অজুহাতে) হাদীসের ভাষ্যে বর্ণিত শাস্তির উপযোগী করা হলো না, এমতাবস্থায় (যারা হাদীসের ব্যাপকতার ওপর আমল করে, ঐকমত্য ও মতভেদ সর্বাবস্থায় হাদীসে আগত লা'নতের শাস্তি প্রযোজ্য হবে বলে বিশ্বাস করে কাউকে লা'নত করেছে যেমন পূর্ববর্তী বর্ণনায় ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইমাম আহমদ রাহেমাহুল্লাহ সহ আরও অনেকে কারও কারও মতভেদের বিষয়টি আমলে না নিয়ে হাদীসের ভাষ্য অনুসারে লা'নত করেছেন, সেসব) লা'নতকারী ব্যক্তিদেরকেই তো অভিশপ্ত হতে হয়। যার ফল এই দাঁড়ায় যে, যে সকল মুজতাহিদ বিরোধপূর্ণ মাসায়েলকেও হাদীসে বর্ণিত শাস্তির আওতাভুক্ত মনে করেছেন, তাদের জন্য সে শাস্তির ধমকি অবধারিত। (অর্থাৎ তাদেরকেও অভিশপ্ত বলতে হয়; কারণ তারা লা'নতের উপযুক্ত নয়, এমন লোকদের লা'নত করেছেন।)

এখন যেহেতু স্পষ্ট হলো যে, সর্বাবস্থায়ই সমস্যাটি বিদ্যমান, অর্থাৎ ভিন্নমত আছে এমন অবস্থা বাদ দেওয়া অথবা তা বাদ না দেওয়া সর্বাবস্থাতেই লা'নতের বিষয়টি আপতিত হচ্ছে, সেহেতু বুঝা যাচ্ছে যে, আসলে এটি কোনো সমস্যাই নয়; আর হাদীস দ্বারা (ঐকমত্য

ও ভিন্নমত) সর্বাবস্থায় দলীল গ্রহণ করাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।

আর যদি উভয় অবস্থা (ঐকমত্য ও ভিন্নমত) এর কোনোটিতেই সমস্যাটি প্রমাণিত না হয়, তবে সেখানে ঐ সব হাদীসের ব্যাপকতার ওপর আমল করাটা মোটেই সমস্যা সঙ্কুল নয়। (অর্থাৎ হাদীসের ভাষ্য অনুসারে সেটার শাস্তির ধমকি ঐকমত্য ও মতভেদপূর্ণ) সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য হবে, যদি না সেথায় কোনো শর্ত অনুপস্থিত কিংবা প্রতিবন্ধক না থাকে)।

এটা এ জন্য যে, যখন (কোনো বিষয়ে) বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠা হয় এবং জানা যায় যে, অস্তিত্বের অবস্থায় তাদের প্রবেশ, অস্তিত্বহীন অবস্থার প্রবেশকে বাধ্য করে, তখন দু'টো হুকুমের একটিই প্রতিষ্ঠিত হবে। হয় বাধ্যকতা ও বাধ্যকৃত বস্তুর অস্তিত্ব; আর তা হলো, সব মুজতাহিদের এতে প্রবেশ করা। নতুবা বাধ্যকতা ও বাধ্যকৃত বস্তুর অস্তিত্বহীনতা; আর তা হলো, মুজতাহিদদের সকলের প্রবেশ না করা। কেননা বাধ্যকৃত বস্তু পাওয়া গেলে বাধ্যকতা পাওয়া যায়। আর বাধ্যকতা না থাকলে বাধ্যকৃত বস্তুও থাকে না।

এটুকু বর্ণনাই (উপরোক্ত) প্রশ্নকারীর প্রশ্ন বাতিলের জন্য যথেষ্ট। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুজতাহিদগণ উল্লিখিত যেমনটি সাব্যস্ত হলো, দুই অবস্থার কোনো অবস্থাতেই শাস্তির সম্মুখীন হবেন না। কেননা শাস্তি প্রযোজ্য হবার শর্ত হলো ওযর আপত্তি না থাকা। আর যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে ওযরসম্পন্ন, সে কখনও শাস্তির অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর মুজতাহিদগণ হলেন ওযরসম্পন্ন, তাদের ওযর গৃহীত হবে। শুধু তাই নয়, তারা সাওয়াবও প্রাপ্ত হবেন। সুতরাং তাদের বেলায় শাস্তিতে প্রবেশের শর্ত রহিত হয় এবং তাদের বলায় কখনও শাস্তি প্রযোজ্য হবে না, তাতে হাদীসকে তার যাহের (যা দ্বারা স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায়, কিন্তু তাতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে অন্য অর্থ করার সুযোগ রয়েছে এমন) অর্থে থাকার বিষয়টিই বিশ্বাস করুক বা সেটিকে বিশ্বাস করুক যে, এর অর্থের মধ্যে মতভেদ থাকার কারণে সেখানে ওযর গ্রহণযোগ্য হবে। (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়ই তার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে)। এটি[127] একটি বিরাট বাধ্য-বাধকতা; যা থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই। তবে নিম্নে বর্ণিত এক অবস্থার দিকে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

দশম জবাবের ওপর একটি আপত্তি ও তার জবাব

প্রশ্ন: আর সেটি হচ্ছে, প্রশ্নকারী এটা বলতে পারে, আমি মেনে নিচ্ছি যে, মুজতাহিদগণের কেউ কেউ বিরোধপূর্ণ মাসআলায় লিপ্ত ব্যক্তিকেও শাস্তির উপযোগী বলে মনে করেন এবং সে বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে মতভেদপূর্ণ স্থানেও শাস্তির ধমকির বিষয়টিকে নিয়ে আসেন। ফলে তিনি উদাহরণতঃ যে এ কাজ করবে, তাকে লা'নত করে থাকেন। তবে তিনি তার এ বিশ্বাসে এমন ভুলের ওপর রয়েছেন; যে ভুলের ওযর রয়েছে এবং তার জন্য তিনি সাওয়াবওপ্রাপ্ত হবেন। সুতরাং তিনি না হক কাউকে লা'নত করার কারণে যে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়, সে শাস্তির আওতামুক্ত থাকবেন। কারণ, আমার (প্রশ্নকারীর) নিকট না হক

---

[127] এর দ্বারা দশম কারণটিই উদ্দেশ্য। [সম্পাদক]

কাউকে লা'নত করার কারণে শাস্তির ধমকির আওতাভুক্ত হওয়ার বিষয়টি তখনই আসবে যখন এমন কাউকে লা'নত করবে যাকে লা'নত করা সর্বসম্মতভাব হারাম। সে হিসেবে যে ব্যক্তি, সর্বসম্মতভাবে লা'নত করা হারাম, এমন কাউকে লা'নত করবে, তাকেই লা'নতের কারণে বর্ণিত সে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

আর যখন লা'নত বা অভিশাপের বিষয়টিও মতবিরোধপূর্ণ; সেহেতু সে স্থানটিও শাস্তির ধমকিযুক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত হবে না, যেমনিভাবে সে ব্যক্তি শাস্তির ধমকিযুক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত নয় যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যার হালাল হওয়া ও সেটা সম্পাদনকারীর প্রতি লা'নতের বিষয়টি মতভেদপূর্ণ।

সুতরাং যেভাবে প্রথম শাস্তির ধমকি থেকে মতভেদপূর্ণ স্থানকে বের করেছি, তেমনিভাবে দ্বিতীয় শাস্তির ধমকি থেকেও মতভেদপূর্ণ স্থানকে বের করে নেব। আর আমি বিশ্বাস করব যে, শাস্তির ধমকিযুক্ত হাদীসসমূহ দু' দিকেই মতভেদপূর্ণ স্থানকে শামিল করে না। যে কাজটি জায়েয করার বিষয়েও নয়; আবার সে কাজ সম্পাদনকারীকে লা'নতের বিষয়েও নয়; চাই সে এ কাজটি জায়েয বলে বিশ্বাস করুক বা না-ই করুক।

সুতরাং আমি (প্রশ্নকারী) দু' অবস্থাতেই সেটা সম্পাদনকারীকে লা'নত করা জায়েয মনে করি না। অনুরূপভাবে যে সে কাজ করবে তাকে যে লা'নত করবে সে লা'নতকারীকে লা'নত করাও আমি বৈধ মনে করি না। (নিষিদ্ধ) কাজটির সম্পাদনকারী এবং তার জন্য অভিশাপকারী,

তাদের কাউকেই আমি শাস্তির ধমকিযুক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত বলে বিশ্বাস করি না। আর আমি অভিশাপদানকারীর সাথে সে ব্যক্তির মত কঠোরতা করি না যে ব্যক্তি তাকে মনে করে যে সে শাস্তির ধমকির মুখোমুখি হয়েছে। বরং মতভেদপূর্ণ (লা'নতের বা শাস্তির ধমকি এসেছে এমন) কাজ করার কারণে কাউকে লা'নত করা আমার নিকট ইজতেহাদী মাসআলার অন্তর্ভুক্ত। আর আমি মনে করি যে সে ভুলে লিপ্ত আছে, যেমনিভাবে আমি কাজটিকে মোবাহ (হালাল) বিশ্বাসকারীকেও ভুলের ওপর আছে বলে বিশ্বাস করি। কারণ; মতভেদপূর্ণ স্থানে তিনটি মত রয়েছে:

১. কাজটি জায়েয বা বৈধ হওয়ার মত পোষণ করা।

২. কাজটি হারাম এবং তার আমলকারী শাস্তির সম্মুখীন হবে বলে মত দেওয়া।

৩. কাজটি হারাম, কিন্তু আমলকারীর ওপর এই ভীষণ শাস্তি প্রযোজ্য হবে না বলে মত প্রকাশ করা।

আমি এই তৃতীয় মতটিই গ্রহণ করি। কেননা কাজটি হারাম বলে যেমন দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনিভাবে মতভেদপূর্ণ স্থানে কর্ম সম্পাদনকারীকে লা'নত করাও হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ঐ সব কাজের আমলকারী এবং আমলকারীকে অভিশাপকারীর শাস্তির ধমকি সম্বলিত যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তা উপরোক্ত দু'টি অবস্থাকে শামিল করে না।

প্রশ্নের জবাব

উল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে,

(১) ঐ সব কাজের আমলকারীকে লা‘নত বা অভিশাপ দেওয়া যদি তোমাদের নিকট ইজতেহাদী মাসআলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তো (ইজতিহাদী মাসআলার নিয়ম অনুসারে) দালিলিক ভাষ্যে বর্ণিত যাহের অর্থের দ্বারাই সেটার (লা‘নত করার) ওপর দলীল গ্রহণ করা জায়েয হয়ে যায়। কেননা তখন বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রের জন্য শাস্তির ধমকি আগত হাদীস নিরাপদ নয় (অর্থাৎ বিরোধপূর্ণ স্থানেও তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়)। আর হাদীসের চাহিদা বাস্তবায়ণ উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়; সুতরাং ঐ হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

আর যদি সেটাকে ইজতিহাদী মাসায়েলে শামিল না করা হয়, তা হলে ঐ কাজের আমলকারীকে লা‘নত বা অভিশাপ দেওয়া অকাট্যভাবে হারাম সাব্যস্ত হয়ে যায়।

আর সন্দেহ নেই যে, যদি কোনো ব্যক্তি মুজতাহিদকে অকাট্যভাবে হারাম কোনো লা‘নত দেয়, সে ব্যক্তি অবশ্যই লা‘নতকারী সম্পর্কে বর্ণিত শাস্তির সম্মুখীন হবে, যদিও সে তাবিলপূর্বক কাজটি করে থাকে। তার উদাহরণ সে ব্যক্তির মত যে কোনো সালাফে সালেহীনকে লা‘নত দিল।

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, (প্রশ্নকারীর) এ কথা অনুসারে (এক কথার) ‘দাওর’ বা পুনরাবৃত্তি বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। চাই তুমি

বিরোধপূর্ণ কাজের আমলকারীর ওপর লা'নত সুনিশ্চিতভাবে হারাম বল, বা সেখানে মতভেদ করার সুযোগ দাও। আর এই যে বিশ্বাসের কথা তুমি বললে তা উভয় ক্ষেত্রেই শাস্তি সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আর বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

(২) প্রশ্নকারীকে আরও বলা যেতে পারে, উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এটা সাব্যস্ত করা নয় যে, বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রকে শাস্তির ধমকি আসা হাদীস শামিল করে; বরং আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এটা জেনে নেওয়া যে, শাস্তি সম্পর্কিত হাদীসগুলো দ্বারা বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে দলীল নেওয়া যাবে কি না? আর এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, (এসব শাস্তির ধমকিসম্পন্ন) হাদীস দ্বারা দু'টি হুকুম সাব্যস্ত হয়:

১. হাদীসে বর্ণিত কাজটি হারাম হওয়া।

২. হারামে লিপ্ত ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন হওয়া।

আর তুমি যা উল্লেখ করেছ তা তো শুধু এটাকেই আলোচনা করেছে যে, উল্লিখিত হাদীস শাস্তির ধমকির ওপর প্রমাণবহ নয়।

আর এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, হাদীস দ্বারা বস্তুটি যে হারাম সেটা প্রমাণ করার বর্ণনা দেওয়া। এখন তুমি (প্রশ্নকারী) যদি একথা মেনে নাও যে, অভিশাপকারী সম্পর্কিত শাস্তির হাদীসগুলো বিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোতে লা'নত করাকে শামিল করে না, তাহলে তো বিরোধপূর্ণ লা'নতের স্থানে কাজটি হারাম হওয়ার দলীলও অবশিষ্ট থাকে না। আর অত্র অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি বিরোধপূর্ণ

মাসায়েলের অভিশাপ সম্পর্কিত ছিল। যদি ঐ কাজ হারাম না হয়, তাহলে ওটাকে জায়েয ও হালাল বলতে হবে[128]।

(৩) অথবা প্রশ্নকারীকে এও বলা যেতে পারে যে, যখন (শাস্তির ধমকি এসেছে এমন কাজ সম্পাদনকারীকে) লা'নত করার কাজটি হারাম বলে প্রমাণিত হয় নি, তখন ওটা হারাম হওয়ার আকীদা বা দৃঢ় বিশ্বাস রাখাও ঠিক নয়। আর সেটা জায়েয হওয়ার দাবীও প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, সেটা হচ্ছে ঐ হাদীসগুলো, যাতে (শাস্তির ধমকি আগত কাজের) আমলকারীকে লা'নত করা হচ্ছে, আর আলিমগণ তাকে লা'নত করার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন, সে হিসেবে তো ঐ অবস্থায় দলীল দ্বারা লা'নত হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং যাতে অভিশাপ জায়েয হওয়া বুঝায়, ঐ সমস্ত দলীলের ওপর আমল অবশ্য করণীয়। বিশেষ করে, যখন বিপক্ষীয় কোনো দলীল পাওয়া যাবে না। আর এতে করে প্রশ্নটিই বাতিল প্রমাণিত হয়ে যায়।

তবে এতে করে বিষয়টি অন্য দিক থেকে প্রশ্নকারীর ওপরও বর্তায়; এই দ্বিতীয় 'দাওর' বা পুনরাবৃত্তির বিষয়টি এজন্যই প্রকাশ পাচ্ছে; কারণ সাধারণত যে সব হাদীসে লা'নতকে হারাম করা হয়েছে, সেসব হাদীসেই শাস্তির ধমকি সম্বলিত।

---

[128] অথচ কাজটিকে হালালও তো বলা যাচ্ছে না। [সম্পাদক]

এখন যদি বিরোধপূর্ণ মাসআলায় শাস্তি সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা দলীল নেওয়া জায়েয না হয়, তবে বিরোধপূর্ণ মাসআলায় সেগুলো দ্বারা লা‘নত করাও জায়েয হয় না। যেমনটি পূর্বে গত হয়েছে।

আর যদি প্রশ্নকারী বলে যে, আমি লা‘নত হারাম হওয়া সম্পর্কে ইজমা’ (সম্মলিত রায়) দ্বারা দলীল দিতে পারি।

তবে তাকে উত্তরে বলা হবে ইজমা‘ এ কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বিশিষ্ট কোনো ইমাম বা সালাফে সালেহীনকে লা‘নত দেওয়া হারাম।

তবে উল্লিখিত ব্যক্তিদের প্রতি লা‘নতের বিষয়টি তাতে যে মতভেদ রয়েছে তা ইতোপূর্বেই তুমি জানতে পেরেছ।

ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে, যখন কোনো বিশেষ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের লা‘নত করা হয়, তখন সেই লা‘নত ঐগুণে গুণান্বিত সকল ব্যক্তির ওপর পতিত হওয়া আবশ্যক করে না। যতক্ষণ না সেখানে যাবতীয় শর্ত পাওয়া না যায় এবং প্রতিবন্ধকতাও দূর না হয়। অথচ এখানে ব্যাপারটি এরূপ নয়।

তাকে আরও বলা যায় যে, ইতোপূর্বে ঐ হাদীসগুলোকে শুধু মতৈক্যপূর্ণ মাসআলার ওপর নির্দিষ্ট করা নিষিদ্ধ করে যে সব দলীল পেশ করা হয়েছে সেগুলোও এখানে নিয়ে আসা যাবে (প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য) যাতে করে সেগুলো এ প্রশ্নকে বাতিল করে দেয়। যেমনিভাবে পূর্বে বর্ণিত মূল প্রশ্নটিও বাতিল করা হয়েছিল।

এরূপ বর্ণনা দ্বারা দলীলকে অন্য দলীলের ভূমিকাসমূহের একটি ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করা নয়; যে বলা হবে, এ তো দীর্ঘ সূত্রিতার সাথে একটি দলীল মাত্র। (বরং এখানে প্রশ্নের উত্তরে দু'টি দলীল পেশ করা হলো)

কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য এটা বর্ণনা করা যে, তারা যে সমস্যার কথা মনে করেছিল তা উভয় অবস্থাতেই সমভাবে আবশ্যক হয়ে পড়ে। সুতরাং সেটি আর সমস্যাই থাকছে না। এভাবে একই দলীল এটা প্রমাণ করছে যে, ১. (শাস্তির ভীতি প্রদর্শিত) হাদীসের ভাষ্যসমূহের মধ্যে মতভেদপূর্ণ স্থানগুলোও সে দলীল দ্বারা উদ্দেশ্য। ২. আর এ উদ্দেশ্য গ্রহণে কোনো সমস্যা নেই।

তাছাড়া এও কোনো অপছন্দনীয় কাজ নয় যে, যা কোনো মাসআলার একটি দলীল হবে, তা অন্য মাসআলার দলীলের ভূমিকা হবে। যদি এদের পরস্পর একে অন্যের সম্পূরক হয়।

একাদশ জবাব

যখন শাস্তির হাদীস দ্বারা হারাম বুঝায়, তখন তাতে আমল করা আলিমগণের সম্মিলিত রায় মোতাবেক ওয়াজিব।

অবশ্য শাস্তির হাদীসগুলোর কোনো একটি শাস্তির ওপর আমল করার ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু ঐ হাদীস দ্বারা যে হারাম প্রমাণিত হবে এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো মতভেদ নেই।

বিজ্ঞ সাহাবীগণ, তাবেঈন ও ফকীহগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাদের ভাষণে ও পুস্তকে বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্র ইত্যাদিতে এ জাতীয় হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে চলেছেন।

বরং যদি হাদীসের মধ্যে কোনো কাজের ব্যাপারে শাস্তির হুমকি-ধমকি আসে, তবে সেটা দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত, যা প্রতিটি অন্তরই বুঝতে পারে।

ইতোপূর্বে আরও দৃষ্টি আকর্ষণ গত হয়েছে যে, যারা এ জাতীয় হাদীস দ্বারা আমল করা এবং শাস্তি আপতিত হওয়ার বিশ্বাস করে থাকেন তাদের কথাই অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। আর সেটাই হচ্ছে অধিকাংশের অভিমত।

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যে বিষয়ে কোনো সম্মিলিত রায়[129] রয়েছে, সেখানে অপর কোনো প্রশ্নই গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বাদশ জবাব

শাস্তির ধমকি আগত দলীল কুরআন ও হাদীসে অনেক বেশি। কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত সেসব দলীলের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাপক ও নিঃশর্তভাবে সেগুলোর ওপর আমল করা ওয়াজিব।

---

[129] এখানে শাইখুল ইসলাম অধিকাংশের মতামতকে সম্মিলিত রায় হিসেবেই দেখছেন।

সুতরাং কাউকে নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না যে, এ ব্যক্তি অভিশপ্ত, গজবপ্রাপ্ত অথবা জাহান্নামের উপযোগী। বিশেষ করে, ঐ ব্যক্তি সৎ ও পূণ্যবান হলে তাকে এরূপ বলা জঘন্য অন্যায়।

নবীগণ ছাড়া অন্যান্যদের পক্ষ হতে সগীরা ও কবীরা গুনাহের সম্ভাবনা

কেননা নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম ব্যতীত অন্যান্যদের পক্ষ হতে সগীরা ও কবীরা গুনাহ হওয়া সম্ভব, যদিও ঐ ব্যক্তি সিদ্দীক (সত্যবাদী), শহীদ অথবা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

কেননা পুর্বে বলা হয়েছে যে, তাওবা ইসতেগফার (গুনাহ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করা) গুনাহ মোচনকারী নেক কাজ, গুনাহ খণ্ডনকারী, মুসিবত, গৃহীত সুপারিশ অথবা শুধু আল্লাহর ইচ্ছা ও রহমতে গুনাহর শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

সুতরাং আমরা যখন আল্লাহর বিভিন্ন আয়াত অনুসারে শাস্তির কথা বলব, যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠﴾ [النساء: ١٠]

“যারা ইয়াতীমের মাল অত্যাচারপূর্বক ভক্ষণ করে, তারা তাদের পেটে আগুন প্রবেশ করিয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০]

এবং আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

﴿وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤﴾ [النساء: ١٤]

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং প্রদত্ত সীমা লংঘন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আর সেখানে সে চিরস্থায়ী হবে। এবং তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪]

আল্লাহ তা'আলার অন্য বাণী,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠ ﴾ [النساء: ٢٩، ٣٠]

"তোমরা অসৎ উপায়ে পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করো না। তবে হ্যাঁ, উভয় পক্ষের মধ্যে সন্তুষ্টিমূলক ব্যবসা বাণিজ্য করতে পার। আর তোমরা অন্যদের অন্যায়ভাবে কতল করো না। আল্লাহ তোমাদের ওপর দয়াশীল। আর যে ব্যক্তি উল্লিখিত কাজগুলো অন্যায় ও বিরুদ্ধাচরণ পূর্বক করবে তাকে আমি শীঘ্রই জাহান্নামে প্রবেশ করাব। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯-৩০] এ রকম আরও বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এ আয়াতসমূহ অনুযায়ী আমরা যখন শাস্তির কথা বলব

অথবা যখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অনুসারে শাস্তির কথা বলব, যেমন হাদীসে এসেছে,

“শরাব পানকারী, মাতা পিতার সাথে নাফরমান ও অবাধ্য অথবা জমির সীমানা পরিবর্তনকারীর ওপর আল্লাহ তা‘আলার লা‘নত বা অভিশাপ”[130]।

অথবা “চোরের ওপর আল্লাহর লা‘নত বা অভিশাপ”[131]।

অথবা “সুদখোর, এর স্বাক্ষীদাতা ও এর লেখকের ওপর আল্লাহর অভিশাপ”[132]।

অথবা “সদকায় টালবাহানাকারী ও সীমালংঘনকারীর ওপর আল্লাহর অভিশাপ”[133]।

অথবা “মদীনায় যে নতুন কিছু ঘটায় (বিদ‘আত করে), বা যে কোন বিদা‘আতী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়, তার ওপর আল্লাহর, মালাইকা ও সকল লোকেরা লা‘নত বা অভিশাপ”[134]।

---

[130] কয়েকটি হাদীসের অংশ। দেখুন, মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, নাসাঈ।

[131] সহীহ বুখারী ও মুসলিম, তবে হাদীসের ভাষ্য এখানে সংক্ষেপ করা হয়েছে।

[132] সহীহ মুসলিম।

[133] মসনদে আহমদ।

[134] সহীহ মুসলিম।

অথবা, “যে ব্যক্তি অহংকারস্বরূপ তার ইজার (পায়জামা) গিরার নীচে ঝুলিয়ে রাখে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাদের দিকে তাকাবেন না”[135]।

অথবা “যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না”[136]।

অথবা “যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দেয়, সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়”[137]।

অথবা “যে ব্যক্তি অপরকে পিতা বলে দাবী করে কিংবা অন্য মনিবের আনুগত্য দেখায়, তার জন্য জান্নাত হারাম”[138]।

অথবা “যে ব্যক্তি মুসলিমদের মাল ভক্ষণ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি রাগান্বিত থাকবেন”[139]।

অথবা “যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ দ্বারা অন্য মুসলিমের সম্পদকে হালাল মনে করে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম সুনির্দিষ্ট করেছেন এবং তার ওপর জান্নাত হারাম করেছেন”[140]।

---

[135] আহমাদ, সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[136] সহীহ মুসলিম।

[137] তিরমিযী।

[138] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[139] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[140] সহীহ মুসলিম।

অথবা “যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না”[141]।

অনুরূপ আরও হাদীস যেগুলোতে শাস্তির হুমকি-ধমকি এসেছে, সেগুলোতে কেউ যদি উল্লিখিত কোনো কাজ করে বসে, তাকে নির্দিষ্ট করে এটা বলা জায়েয নেই যে ঐ ব্যক্তি নির্দিষ্ট নিষিদ্ধ কাজ করার ফলে নির্দিষ্ট শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেননা তাওবা ও অন্যান্য শাস্তি মোছনকারী কিছু করে সে উক্ত গুনাহের শাস্তি থেকে ক্ষমা পেতে পারে।

অপর পক্ষে, আমাদের এটাও বলা জায়েয নেই যে, এ হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে সকল মুসলিম ও সব উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর লা‘নত আবশ্যক করে অথবা ছিদ্দিকীন (সত্যবাদীগণ) এবং সালেহীনদের (নেককারদের) ওপর লা‘নত অপরিহার্য করে দেয়। কেননা এটা বলা যায় যে, নেককার সিদ্দীক, যখন তার কাছ থেকে এ ধরণের কোনো কাজ প্রকাশ পাবে, তখন সেখানে অবশ্যই এমন কোনো প্রতিবন্ধক থাকবে যা শাস্তি পতিত হওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে শাস্তি আপতিত হতে বাধা হয়ে দাড়াবে।

কারণ, এসব কাজ যারা ইজতিহাদ বা তাকলিদের কারণে মুবাহ বা জায়েয মনে করে সম্পাদন করে থাকেন, তাদের ব্যাপারে মূল কথা এই যে, তারা হয়ত কতিপয় সিদ্দীকীন, যাদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার

---

[141] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

কারণে এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে না; যেমনভাবে তাওবা, নেক কাজ ইত্যাদি তার জন্য শাস্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

জেনে রাখুন, (শাস্তির ধমকি আগত হাদীসের ব্যাপারে উপরে বর্ণিত পথ ও নীতিতে চলাই অবশ্য করণীয়।

উল্লিখিত পথ ছাড়া অন্যগুলো কু-পথ

এ পথ ছাড়া বাকী দু'টি খবিস বা কুপথ রয়েছে।

প্রথম পথ

এটা বলা যে, শাস্তির ধমকি আগত বিষয়ে যে কেউ ঐ কাজে লিপ্ত হবে, নির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। আর এরূপ দাবী করা যে, এটা বলাই হচ্ছে হাদীসের ভাষ্যের দাবী অনুযায়ী চলা।

এ জাতীয় কথা ও দাবী খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়, যারা যে কোন গুনাহের দ্বারা মানুষকে কাফির মনে করে, তাদের কথার চেয়েও ঘৃণিত।

আর এ মত ও পথ যে বাতিল, তা দীনে ইসলামের অনুসারী সবার জানা রয়েছে। আর এটা বাতিল হওয়ার দলীলসমূহ অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পথ

হাদীস অনুযায়ী কথা না বলা (বিশ্বাস না করা) ও তার দাবী অনুযায়ী আমল না করা এবং দাবী করা যে, ঐ হাদীসের চাহিদা অনুযায়ী কথা বললে যারা এতে আমল না করে তাদের প্রতি দোষারোপ করা হয়।

বস্তুতঃ এ ভাবে (কথা ও আমল) পরিত্যাগ করা মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায় এবং কিতাবিদের (ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান) সাথে সংযুক্ত করে; যারা আল্লাহ ছাড়া তাদের পাদ্রী এবং রাহেবদেরকে এবং ঈসা ইবন মারইয়ামকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তারা পাদ্রীদের ইবাদত করে নি, বরং পাদ্রীরা তাদের জন্য হারামকে হালাল করেছে, অতঃপর তারা তাদের অনসরণ করেছে এবং হালাল বস্তুকে হারাম করেছে, পরে তারা তাদের অনুসরণ করেছে[142]।"

আর এটা সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় সৃষ্টজীবের আনুগত্য করার দিকে ধাবিত করে।

তাছাড়া এটি মানুষকে খারাপ পরিণামের দিকে পরিচালিত করে এবং আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী থেকে যা বুঝা যায় তার অপব্যাখ্যা দেওয়া হয়। আল্লাহ বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾ [النساء: ٥٩]

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং ইমাম ও ক্ষমতাশীনদের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি হয়, তা হলে আল্লাহ ও রাসূলের স্মরনাপন্ন

[142] আহমাদ, তিরমিযী, ইবন জারীর, আদী ইবন হাতেম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে।

হও, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস আনয়ন করে থাক। এটাই তোমাদের জন্য মংগল ও পরিণামে উৎকৃষ্টতর। [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের বিরোধিতা পথভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত করে

তারপর আলিমগণ বহু বিষয়ে মতভেদ করেছেন। যদি প্রত্যেক খবর বা হাদীস, যার মধ্যে কঠোরতা আছে, তাতে যদি কেউ মতভেদ করে, আর সে মতভেদ থাকার কারণে তাতে কঠোরতা থাকায় সে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী কথা না পরিত্যাগ করা হয় কিংবা সাধারণভাবে তাতে আমল ছেড়ে দেয়, তা হলে এমন সমস্যা তৈরি হবে, যা কুফুরী এবং দীন থেকে খারিজ হওয়ার চেয়ে ভয়াবহ।

এতে সমস্যা যদি পূর্বের (কুফুরীর) চেয়ে ভয়াবহ নাও হয়, তবে তার চেয়ে কমও হবে না।

সুতরাং আমাদের উচিত আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবে আমল করা এবং পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনা এবং আমাদের রবের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে ঐ সমস্ত হুকুমই পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা। এমন যেন না হয় যে, আমাদের রিপু ও প্রবৃত্তির তাড়নায় তার কিয়দংশে ঈমান আনব আর বাকী অংশ পরিত্যাগ করব, কোনো কোনো সুন্নাহ্ অনুসরনের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তর নরম হবে, আর বাকীগুলো গ্রহণ করা থেকে পালিয়ে বেড়াব। কারণ এটা করার অর্থ সরল ও সঠিক রাস্তা থেকে বের হয়ে আল্লাহ তা‘আলার অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথে গমন করা।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার মনোনীত পথে পরিচালনা করুন এবং কাজে-কর্মে ও কথাবার্তায় আমাদেরকে ও সকল মুসলিমদেরকে মঙ্গলের দিকে ধাবিত করুন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব্ব।

আর আল্লাহ দুরূদ পেশ করুন মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি, যিনি শেষ নবী, তাঁর হিদায়াতপ্রাপ্ত সাহাবীগণ ও তাঁর স্ত্রীগণের প্রতি, যারা মুমিনগণের মাতা এবং সুন্দরভাবে তাদের তাবে‘ঈ তথা অনুসারীদের প্রতি, যারা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় আসতে থাকবে। আর আল্লাহ তাদের সবার ওপর সালাম পেশ করুন যথার্থরূপে।

এ গ্রন্থে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ প্রখ্যাত মুজতাহিদ ইমামদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর আরোপিত বিভিন্ন অভিযোগের জবাব দিয়েছেন এবং কিছু হাদীসের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানের কারণ ও ওযরসমূহ বর্ণনা করেছেন, যেন কোনো মূর্খ বিরোধিতকারী এসে মুসলিম আলিমদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের সম্মানহানির অপচেষ্টা না করে।